নাট্যপ্রতিভা সিরিজ

ষষ্ঠ সংখ্যা।

অর্দ্ধেন্দুশেখর।

সম্পাদক—

নটি কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক,

শুভ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ,

বি, এ (কলিকাতা), এম্, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

শিশির পাব্লিশিং হাউস্,

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,

কলিকাতা।

টাকা মাত্র।

কাতা, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
শর পাব্লিশিং হাউস্ হইতে
শির কুমার মিত্র, বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৯৬নং ...
এল, ...
শ্রীলক্ষ্মীনারা...
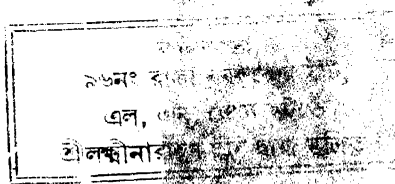
অর্দ্ধেন্দুশেখর।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্য ও অভিনয়দীক্ষা।

কবি ও অভিনেতা ঐশীশক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কেবল শিক্ষায় গঠিত হয় না। কবি ও অভিনেতার উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজন বটে, কিন্তু কেবল শিক্ষায় কবি কিম্বা অভিনেতা হওয়া যায় না। স্বভাবপ্রদত্ত নিগূঢ় প্রতিভা ভিতরে থাকা আবশ্যক। অর্দ্ধেন্দুশেখর সেইরূপ অভিনেতা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের সমাজে অভিনেতার আদর নাই, সমাজ অভিনেতাকে ঘৃণা করে, কাজেই নিজেকে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দিতে সকলেই বেশ একটু 'কিন্তু' হইয়া পড়েন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজেকে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দিতে 'কিন্তু'তো বিন্দুমাত্রই হইতেন না, বরং গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

বাঙ্গালা দেশে অভিনেতার অভাব নাই,—আজ কাল রাম, শ্যাম, যদু সকলেই অভিনেতা। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর ঠিক সেরূপ নামে অভিনেতা ছিলেন না, তিনি যথার্থই অভিনেতা ছিলেন,—ভগবান তাঁহাকে অভিনেতা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে আমরা আজ কাল যাঁহাদের অভিনেতা বলিয়া দেখিতে পাই, সেরূপ শত শত অভিনেতা ও অভিনেত্রী অর্দ্ধেন্দুশেখর গড়িয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র

অর্দ্ধেন্দুশেখর

ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের মত লোক যদি বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহাহইলে বোধহয় বাঙ্গালা দেশে সাধারণ রঙ্গালয় বলিয়া একটা কিছুই থাকিত না। বঙ্গ রঙ্গালয় শত শোভায় শোভিত হইয়া, আজ যে শত লোকের আনন্দ ও প্রশংসা লইয়া, কলিকাতার বুকের উপর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবল তাঁহাদেরই জীবনব্যাপী প্রাণ-ঢালা পরিশ্রমের ফল।

অর্দ্ধেন্দুশেখর শ্যামবাজার নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ মুস্তোফী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্যামাচরণবাবু বড় রসিক ও উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার নয়নের মণি ছিলেন। তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরকে যত ভালবাসিতেন পুত্রকে পিতার এতটা ভালবাসা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন অতি শিশু তখন তিনি পুত্রটীকে দিনরাতই কোলে লইয়া থাকিতেন। পাছে পুত্রের কোনরূপ অমঙ্গল হয় এই আশঙ্কায় তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পুত্রটিকে অপরের কোলে প্রদান করিতে পারিতেন না।

শ্যামাচরণবাবু মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের মাতুল ছিলেন। "মহারাজ বাহাদুর" তাঁহার মাতুলকে বড় স্নেহ করিতেন, এবং যখন তখন মাতুলালয়ে যাইয়া নানা রূপ আদরের উপদ্রব করিয়া শ্যামাচরণবাবুকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। যে দিন অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রথম ধরায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন সেইদিন মহারাজ বাহাদুর মাতুলালয়ে আসিয়া, 'মামা তোমার ছেলে দেখাও' বলিয়া শ্যামাচরণবাবুকে এমনই 'অতিষ্ঠ' করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে

শ্যামাচরণবাবু তাঁহার ভগিনীকে 'তোর ছেলেটাকে সামলা বাবু' বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এই কলিকাতা মহানগরীর বাগবাজার পল্লীতে পিতার ভবনে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম হয়। সেদিন কি বার কি তিথি ছিল তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমরা এটুকু বলিতে পারি যে, সেদিন যে তিথি বা যে নক্ষত্রই হউক, তাহা যে অতি শ্রেষ্ঠ তিথি ও নক্ষত্র তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কেননা অর্দ্ধেন্দুশেখর যে অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাদৃশ প্রতিভাবান ব্যক্তির কখনই হীন তিথি ও নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ হইতে পারে না। কাজেই বলিতে হইবে এক মহা শুভদিনে শুভক্ষণে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম হইয়াছিল।

শ্যামাচরণবাবুর বাটীর সম্মুখেই স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয়ের বাটী ছিল। নিয়োগী মহাশয় ও ৺দীননাথ বসু প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির উদ্যোগে কৃষ্ণকিশোরবাবুর বাটীতে একটী 'মরণিং স্কুল' স্থাপিত হয়। এই 'মরণিং স্কুলে'ই অর্দ্ধেন্দুশেখরের হাতে খড়ি, এই স্কুলেই শৈশবে অর্দ্ধেন্দুশেখর লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে কবিবর গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

'অর্দ্ধেন্দুশেখর—স্বর্গীয় মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের মাতুল বাগবাজার নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ মুস্তোফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুস্তোফী মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাটীতে নিয়োগী মহাশয়ের ও ৺দীননাথ বসু প্রভৃতি কতিপয়

কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের উদ্যোগে একটী মরণিং স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ স্কুলে আমি বালক অর্দ্ধেন্দুকে প্রথম দেখি।”

অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটারকে যত ভাল বাসিতেন, আজকাল কোন অভিনেতাই আর সেরূপ ভাবে থিয়েটারকে ভালবাসেন না। তিনি যে চক্ষে থিয়েটারকে দেখিতেন, সেরূপ চক্ষেও আজ কাল থিয়েটারকে আর কোন অভিনেতা দেখেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের চিরকালের একটা ভাবনাই ছিল যেন অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আজ কাল যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী বঙ্গ-রঙ্গালয়ে অভিনয় করেন, তাঁহাদের অনেকেরই থিয়েটারের উপর বিন্দু-মাত্রও হৃদয়ের প্রীতি নাই, এবং অভিনয় কলার অভ্যুন্নতির দিকে তাঁহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, তাঁহাদের কেবল মাস কাবারের দিকে দৃষ্টি থাকে, কোন ক্রমে মাস কাবার হইলেই হইল। এরূপ অভিনেতা অভি-নেত্রীর নিকট নাট্যকলার উন্নতির আশা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাদের অভিনয় কলার অভ্যুন্নতির জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা নাই, যাহারা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অভিনয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা নিখুঁত অভিনয় কিছুতেই হইতে পারে না,—তাঁহাদের অভিনয় সেইজন্য কতকটা ঢংএর মত হইয়া দাঁড়ায়, আসল জিনিষ কিছুই ফুটিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই বঙ্গ রঙ্গালয়ে ক্রমশঃ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দিন দিন যে উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতেছে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটারকে যে কি চক্ষে দেখিতেন, থিয়েটার তাঁহার যে কত প্রিয় ছিল, সে সম্বন্ধে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, “যাঁহারা কায়মনোবাক্যে রঙ্গালয়প্রিয় ছিলেন তাঁহাদের

মধ্যে অর্দ্ধেন্দু সর্ব্বাগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাঁহার জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার জপ ছিল, রঙ্গালয়ের শিক্ষা দান তাঁহার কার্য্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, এমন কি, নাট্যামোদী ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য আত্মীয় ছিল না। সমাজ অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, রঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংসা করে,—আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধি দম্ভভরে পরিচয় দিতেন 'আমি অভিনেতা।"

বাল্যকালে অর্দ্ধেন্দু-শেখরের জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি শৈশবকালেই তাঁহার পিসিমা অর্থাৎ মহারাজ বাহাদুরের মাতা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে লইয়া আসেন এবং সেই হইতে অর্দ্ধেন্দু পাথুরিয়াঘাটায় তাঁহার পিসিমার নিকটই অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন। অর্দ্ধেন্দুর পিসিমাতা অর্দ্ধেন্দুকে জননীর অধিক স্নেহ করিতেন, কাজেই রাজবাড়ীতে তিনি রাজপুত্রের মতই অবস্থান করিতেন। সেখানে তাঁহার আদরের পরিসীমা ছিল না।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের থিয়েটারের বিশেষ সখ ছিল, তিনি তাঁহার বাটীতে একটী থিয়েটারের ষ্টেজ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, এবং মাঝে মাঝে তথায় এক একখানি নাটকের অভিনয় করাইয়া নাট্যপ্রিয় ব্যক্তিগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। পিসিমাতার সহিত অর্দ্ধেন্দু যখন রাজবাটীতে গমন করেন সেই সময়ে রাজবাটীতে প্রায়ই অভিনয় হইত। এই সকল অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখর এতই আগ্রহের

সহিত দেখিতেন যে, যেদিন রাজবাড়ীতে অভিনয় হইত সেদিন আর তাঁহার স্নান আহার করিতেও মনে থাকিত না। কেমন করিয়া ভাল স্থানটুকু পাইবেন, কেমন করিয়া থিয়েটার আগাগোড়া দেখিবেন, তাহাই হইত সেদিন তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয়। অভিনয় হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই একটী ভাল স্থান দখল করিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সে সময় সেস্থান হইতে তাঁহাকে নড়াইবার কাহারও সাধ্য ছিল না। জনশ্রুতি আছে, একদিন এইরূপ রাজবাড়ীতে অভিনয় হইবার আয়োজন হয়। কাজের বাড়ী, চারিদিকে গোলমাল, এ অবস্থায় রাত্রির আহার শেষ করিয়া আসিয়া থিয়েটার দেখিতে হইলে ভাল স্থান পাইবার আশা অতি অল্প। সেইজন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর আহার না করিয়াই অভিনয় আরম্ভ হইবার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া একটী ভাল স্থান লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তখন তথায় একজনও দর্শক ছিল না। এমন কাহার খাইয়া দাইয়া আর কাজ নাই যে সে দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া অভিনয় দেখিবার জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? কাজেই সমস্ত আসর শূন্য, কেবল একাকী অর্দ্ধেন্দুশেখর একখানি চেয়ার জুড়িয়া বসিয়া আছেন। বাটীতে রাত্রে থিয়েটার হইবে বলিয়া সন্ধ্যার পরই বাটীর ছোট ছোট ছেলেদের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আহারের স্থানে সকল বালকই আহারে বসিয়াছে, কেবল অর্দ্ধেন্দুশেখর নাই। মহারাজ বাহাদুরের মাতা কি একটা কার্য্য উপলক্ষে বাটীর বালকেরা যে স্থানে আহার করিতে বসিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়াছিলেন; তিনি বালকদিগের ভিতর অর্দ্ধেন্দুশেখরকে

না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা সবাই খেতে বসেছিস, অর্দ্ধেন্দু কোথায় ?"

মহারাজ বাহাদুরের মাতার প্রশ্নে বালকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া উত্তর দিল, "কি জানি, সে কোথায় আছে বলতে পারিনিতো।"

অমনি অর্দ্ধেন্দুর জন্য চারিদিকে খোজাখুঁজি আরম্ভ হইল, মহারাজ বাহাদুরের মাতার আদেশে দুই তিনজন ভৃত্য অর্দ্ধেন্দুকে খুঁজিতে ছুটিল। তাহারা এদিক ওদিক খুঁজিয়া থিয়েটারের আসরে আসিয়া দেখিল, অর্দ্ধেন্দু তথায় একাকী বসিয়া আছে। ভৃত্যেরা রাজমাতার আদেশ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিল, অর্দ্ধেন্দুশেখর কিন্তু নড়িতে চান না, পাছে তিনি স্থানটুকু হারান। ভৃত্যেরা তাঁহাকে বাটীর ভিতর যাইয়া আহার করিবার জন্য অনেক 'সাধাসাধি' আরম্ভ করিল, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর একেবারে অচল অটল। কিছুতেই তিনি নড়িতে চাহেন না। ভৃত্যেরা তাঁহাকে তুলিতে না পারিয়া অন্তঃপুরে গিয়া সংবাদ দিল, তখন মহারাজ বাহাদুরের মাতা অর্থাৎ অর্দ্ধেন্দুশেখরের পিসিমাতা ঠাকুরাণী, তাঁহার একটী দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতাকে অর্দ্ধেন্দুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আবার প্রেরণ করিলেন। সেই ভদ্রলোক অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক বুঝাইলেন ও বলিলেন, "থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ হইবার এখন অনেক বিলম্ব আছে, এত পূর্ব্বে কেহই অভিনয় দেখিতে আসিবে না,—কাজেই তোমার জায়গা যাইবারও কোন আশঙ্কা নাই।"

কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের কর্ণে কাহার কোন কথাই প্রবেশ করিল

না। তাঁহার মুখে সেই এক কথা, "না আমি এখন এখান থেকে উঠ্‌ব না।"

অনাহারে স্থানটুকু রাখিবার জন্য দুই ঘণ্টা যাবৎ ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকা,—কেননা ভাল স্থানে বসিয়া থিয়েটার দেখিতে পাইব, এমন যাঁহার আগ্রহ তাঁহারই অভিনয় দেখা সার্থক, সেই লোকই যথার্থ অভিনয় দর্শন করে। অতিশৈশব হইতেই অভিনয় অৰ্দ্ধেন্দুশেখরের একেবারে প্রাণের ভিতর গাঁথিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর ভিতর তিনি থিয়েটার দেখিতে যত ভাল বাসিতেন, এত ভাল আর কিছুই বাসিতেন না। কোনকালে অৰ্দ্ধেন্দুশেখরের কোন বিষয়ে কোনরূপ সখ ছিল না। তিনি যাহা পাইতেন তাহাই পরিতেন, তাঁহার আহারের কোন খুতখুত ছিল না—ক্ষুধার সময় যাহা কিছু পাইলেই হইল। কিন্তু ঐ নেশা থিয়েটার দেখা, তিনি যদি শুনিতেন কোথায়ও থিয়েটার হইবে তখনি তাহার মাথা খারাপ হইয়া যাইত। কেমন করিয়া তথায় যাইয়া থিয়েটার দেখিবেন তখন হইতে তাঁহার কেবল সেই চিন্তাই হইত। এইরূপ থিয়েটার দেখিবার ঝোকের জন্য বাল্যকালে তাঁহাকে অনেক তিরস্কার ভোগ করিতে হইয়াছে তথাপি তাঁহার সে নেশার একদিনের জন্যও হ্রাস হয় নাই।

অতিশৈশব হইতেই অৰ্দ্ধেন্দুশেখরের আর এক শক্তি ছিল। তিনি লোকের কথাবার্ত্তা চলন বলন অবিকল নকল করিতে পারিতেন। তিনি একবার কাণে যাহা কিছু শুনিতেন, তাহাই একেবারে হুবহু নকল করিতে পারিতেন। থিয়েটারে অভিনয় দেখার অপেক্ষা তাঁহার এই নকল শুনিয়া রাজবাটীর অনেকেই বেশী আনন্দ উপভোগ

করিতেন। এইভাবে পিসিমার স্নেহাঞ্চলের নিম্নে থাকিয়া অর্দ্ধেন্দু-শেখরের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় এবং তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"বাল্যকালে অর্দ্ধেন্দুর পিতৃস্বসা, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননী, তাঁহাকে পাথুরিয়াঘাটার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের অশেষ গুণরাশির মধ্যে নাট্যামোদে উৎসাহপ্রদানে বিশেষ অভিরুচি ছিল। রাজবাটীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয় হইত, অর্দ্ধেন্দুর তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল। গণ্যমান্য ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণের সে সুবিধা ছিল না। মাইকেল তাঁহার কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকায় (preface), যে পূজনীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া নট-কুল-চূড়ামণি বলিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজবাটীর নাট্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। নাটকের মহালাও অর্দ্ধেন্দু ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতেন। অনুকরণপ্রিয় অর্দ্ধেন্দু যে কেবল তাহা শুনিতেন ও দেখিতেন তাহা নয়, বালক হৃদয়ে তাহা দৃঢ় অঙ্কিত হইত। জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও বহু বিবাহ নিন্দা করিয়া রামনারায়ণের 'নব নাটক' অভিনীত হয়। অভিনয়পারদর্শী অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার সেই অভিনয়ের নায়ক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্দ্ধেন্দুর পক্ষে সহজ ছিল।"

অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই সকল অভিনয় দর্শনের সুবিধা থাকায় নাট্যকলা শিখিবার ও জানিবার তাঁহার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্রের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন কেহই

কোন থিয়েটারে যোগদান করেন নাই, তখন উভয়ের কেহই জানিতেন না যে তাঁহারাই ভবিষ্যতে সাধারণ বঙ্গরঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আমি আমার এক বন্ধুর ভ্রাতা লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমভিব্যাহারে দেখি। লোকনাথ 'নকুলে' লোক, দেশ বিদেশের ভাষা অনুকরণ করিতে পারিতেন। লোকনাথ বলিতেছেন, 'বল বল প্যাটের যে কাঙ্গর বলতো?' অর্দ্ধেন্দু পূর্ব্ব-বঙ্গীয় উচ্চারণে এই পংক্তিটী আবৃত্তি করেন। এই আবৃত্তিটী লোকনাথ অনুকরণপটু হইলেও তাঁহার অনুকরণ অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দু-শেখরের অনুকরণ অতিস্বাভাবিক হইল। স্মরণ হইতেছে যেন সে সময় ঠাকুর বাড়ীতে চন্দ্রদান ও উভয় সঙ্কটের অভিনয় চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দু কখন কখন সেই অভিনয়ের অনুকরণ আমার বন্ধুর বাসায় আসিয়া করিতেন।"

অর্দ্ধেন্দুর জীবন যখন এই ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময় থিয়েটারের একটী সম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণের ভিতর যে জাগিয়া না উঠিয়াছিল এমন নহে। তাঁহার মনের সে ইচ্ছাটা বহুদিন তিনি মনের ভিতরই দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা যে খুঁজিতেছিলেন না এমন কথা হইতেই পারে না। তিনি যে ভগবত্-প্রদত্ত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, সে প্রতিভা চাপা থাকিবার নহে,—তিনি নিজেকে দমন রাখিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে, প্রতিভা দমন থাকিবে কেন? ইচ্ছা ও আগ্রহ তাঁহার প্রাণের ভিতর দিন দিন এমনই বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল যে তিনি আর নিজেকে দমন করিতে পারিলেন না। সেই সময় তাহার প্রতিভা যিনি দিয়াছিলেন তিনিই তাহার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে অর্দ্ধেন্দু রাজবাটীতে দুই একখানি নাটকে দুই একটী ভূমিকা অভিনয় করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা সামান্য একটু কারণে রাজবাটীর সহিত তাহার একটু মনোমালিন্য হয়। তিনি অবিলম্বে রাজবাটী পরিত্যাগ করেন ও বাগবাজারে একটী নাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর যে সময় বাগবাজার নাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করেন সেই সময় এই সম্প্রদায়ে কবিবর ৺দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" নাটকের মহাসমারোহে মহালা চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিবার কিছুদিন পরেই নিজ প্রতিভাবলে এই থিয়েটারের শিক্ষক হইয়া দাঁড়ান। এই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়গণ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। সধবার একাদশী নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর "জীবনচন্দ্রের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভূমিকাটীর এমন সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে স্বয়ং গ্রন্থকারকে পর্য্যন্ত বলিতে হইয়াছিল, "এমনটী আশা করি নাই;" তাহার এ অভিনয় যিনিই দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকেই শত মুখে প্রশংসা করিতে হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"বাগবাজারে "সধবার একাদশী" সম্প্রদায়ের আকড়ায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যোগদান করেন। কৃতবিদ্য বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবু, রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে

উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আইসেন। অর্দ্ধেন্দুর "জীবনচন্দ্রের" ভূমিকা (part)। জীবন চন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।"

বাগবাজারের নাট্য সম্প্রদায়ের শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই থিয়েটারে যোগদান করিলে তাঁহাকে সহকারী শিক্ষকের পদ প্রদান করা হয়। এই সম্প্রদায় "সধবার একাদশী"র নাটকের প্রত্যেক ভূমিকাই অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। জনসাধারণ ও স্বয়ং গ্রন্থকারের পর্য্যন্ত প্রশংসা লাভ করিয়া এই সম্প্রদায়ের নূতন নূতন নাটকের অভিনয় করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ শতগুণে বাড়িয়া উঠে। "সধবার একাদশী" অভিনয় হইবার পর তাঁহারা দীনবন্ধু বাবুর "লীলাবতী" নাটক অভিনয় করিবার জন্য আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের শিক্ষকতায় কিছু কিছু বাদ দিয়া লীলাবতী নাটকের মহালা চলিতেছিল। কাজেই বাগবাজারের এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক অভিনেতার কেমন একটা জেদ হইল, যেমন করিয়া হউক চুঁচুঁড়ার অভিনয় অপেক্ষা তাঁহাদের অভিনয় ভাল করিতেই হইবে। অর্দ্ধেন্দু-শেখর দিন রাত পরিশ্রম করিয়া প্রত্যেক অভিনেতাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সম্প্রদায়ে শিল্পী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর ও ছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র পালকে সহকারী লইয়া দিনরাত

পরিশ্রম করিয়া শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত করিলেন। ১২৭৮ সালে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় শ্যামবাজারে ৺রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে ৺ধর্ম্মদাস সুরের নির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইল। লীলাবতী নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর হরবিলাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হরবিলাসের অভিনয় দেখিয়া গ্রন্থকার একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সধবার একাদশীতে জীবনচন্দ্রের ভূমিকা দেখিয়া যত আনন্দিত হইয়াছিলেন এই হরবিলাসের অভিনয় দেখিয়া তাহার শত গুণ আনন্দিত হইলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কত বড় গুণী, নাট্যকলা যে তিনি কতদূর আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই এক হরবিলাসের অভিনয়েই নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ জানিতে পারিয়াছিলেন।

লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইবার পর, দর্শকের আতিশয্য দেখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রস্তাব করিলেন, যে এখন হইতে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করা হউক। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিবার পক্ষে সম্প্রদায়ের সকলেরই মত কেবল একা গিরিশচন্দ্র অসম্মত। কাজেই সম্প্রদায়ের কোন লোকই তাঁহার সে মত গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। গিরিশচন্দ্রের মতে কেহই মত না দেওয়ায় গিরিশচন্দ্র এই সম্প্রদায়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিলেন। গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া

দিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে দলের কাহারও উৎসাহ এক বিন্দুও কমিল না। তাঁহারা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে শিক্ষক করিয়া দীনবন্ধু বাবুর "নীলদর্পণ" নাটকের মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। থিয়েটারের টিকিট বিক্রয় করিতে হইলে একটী রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক। কাজেই পাথুরিয়াঘাটার মোড়ে ৺মধুসূদন সান্যালের বাটীর প্রকাণ্ড চত্বরটী মাসিক ত্রিশ টাকায় ভাড়া লওয়া হইল এবং ধর্ম্মদাস বাবু দিন রাত পরিশ্রম করিয়া তথায় একটী নূতন রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিলেন।

১২৭৯ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ শনিবার অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় গঠিত হইয়া বাগবাজারের নাট্য সম্প্রদায় ন্যাসন্যাল থিয়েটার নাম দিয়া নব রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণ নাটকের মহাসমারোহে অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। নীলদর্পণ নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর একাই চারিটী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ভিতর তিনটী পুরুষের একটী স্ত্রীলোকের। ভূমিকা কয়টী যথা,—উড্ সাহেব, গোলক বসু, জনৈক রায়ত ও সাবিত্রী। এক নাটকে চারিটী ভূমিকা একরাত্রে অভিনয় করা যে কত কঠিন তাহা নাট্যকলায় যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান আছে তিনিও অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই চারিটী ভূমিকা সম্পূর্ণ পৃথক এবং চারি ভাবের। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিভায় তাহাও সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই চারিটী ভূমিকার প্রত্যেকটীতেই অর্দ্ধেন্দুশেখর সমান প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশংসায় সমস্ত কলিকাতা একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে এই সম্প্রদায় টিকিট বিক্রয় করিয়া দীনবন্ধু বাবুর সব কয়খানি নাটকই অভিনয় করিয়াছিলেন, এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায়

নেরই অতি মনোহর অভিনয় হইয়াছিল। এই সকল নাটকের প্রধান ভূমিকাগুলি অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন ভূমিকাগুলি এত সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল যে তাহার পূর্ব্বে ও অনেক বিখ্যাত অভিনেতার দ্বারা সেগুলি অভিনীত হইয়াছিল কিন্তু তেমনটী আজ পর্য্যন্ত আর হইল না।

তাহার পর ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত দক ৺শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত "নয়শো রূপেয়া" নামক এক পুস্তকের অভিনয় হয়। এই পুস্তকে অর্দ্ধেন্দুশেখর "ছাতুলালের" অভিনয় করেন। এই ভূমিকার অভিনয় দেখিয়া অনেকেই বাজার পত্রিকার ৺শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে বলিয়াছিলেন, শো রূপেয়ার" ছাতুলালের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের যে অভিনয় নায়, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারের অভিনেতার দ্বারা তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। মোট কথা অর্দ্ধেন্দু- যখনই যে ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন তাহাই এক নূতন গো ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

য় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর জীবনচন্দ্র দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ ভার পরিচয় পান নাই। লীলাবতীতে অর্দ্ধেন্দুকে "হরবিলাস" য়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে

তাহার পর ন্যাসন্যাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া "নীলদর্পণ" অভিনয় আরম্ভ হইল। অর্দ্ধেন্দু গোলক বসু, সাহেব, এক জন রায়ত ও সাবিত্রীরূপে দর্শক বৃন্দের সম্মুখে ত হইলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই বিস্ময়কর, প্রশংসায় কলিকাতা

পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়াছিলাম দেখি নাই, কারণ ন্যাসন্যাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে আমার সম্পর্ক ছিল না। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক ও প্রহসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর "জলধরের" অভিনয় অতুলনীয়ের মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চহৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা হয় না। সঙ্গীতাচার্য্য ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিতেন, সমাজদার গুণীর গোলাম। আর গুণী সমাজদারের গোলাম।" গুণী অর্দ্ধেন্দুশেখর ও সহৃদয় সমাজদার রাজা চন্দ্রনাথ, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার একটী অকাট্য প্রমাণ। ক্রমে ন্যাসন্যাল থিয়েটারে "নয়শো রূপেয়া" অভিনীত হইল। যাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটার ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃত বাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ ৺শিশির কুমার ঘোষের সম্মুখে অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে "নয়শো রূপেয়ার" ছাতুলালের ভূমিকায় এই বাবুটীর অভিনয় যাহা দেখিলাম তাহা যে, কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অনুনকরণীয় হইত।"

অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, তাহাই যে শুধু নিখুঁত অভিনীত হইত তাহা নহে, তিনি যাহাকে যে ভূমিকাটী শিক্ষা দিতেন, তাহাও অপরূপ হইত। তাঁহার শিক্ষা দিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তিনি যখন যাহাকে যে ভূমিকাটী শিক্ষা দিতেন তাহা

যতক্ষণ না নিখুঁত হইত ততক্ষণ তিনি তাহা কিছুতেই ছাড়িতেন না। যে অভিনেতা শিক্ষা গ্রহণ করিত সে হয়তো বিরক্ত হইয়া উঠিত, তথাপি তাহার নিস্তার নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর ঠিক সেই এক ভাবে বসিয়া, ভূমিকাটী নিখুঁত করিবার জন্য ক্রমাগত বলিয়া যাইতেছেন, বিরক্ত হইবার নামটী নাই। তিনি নিজে যেমন অনন্যসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, তাহার শিক্ষা প্রণালীও তদ্রূপ অদ্ভুত ছিল। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"এতক্ষণ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি শিক্ষাপ্রদানে কিরূপ দক্ষ ছিলেন তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম সধবার একাদশীতে দরওয়ানদ্বয়কে যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেরূপ কেহ পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর মাষ্টার একথা সর্ব্বত্র প্রচার। প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এস্থানে বর্ণিত হইতে পারে না। তাঁহার শিক্ষার পরিচয় ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিনেতা হইতে হইলে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন, অর্দ্ধেন্দুশেখরের সে শিক্ষা বাল্যকালে অনেক হইয়াছিল। বাল্যকালে যখন তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে ছিলেন, সে সময় তাঁহার অনেক বড় বড় নটের অভিনয় দেখিবার মহাসুযোগ ঘটিয়াছিল। শুধু এই সকল নটের অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার অভিনয় বিদ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই, অভিনয় শিক্ষার জন্য ইহা ব্যতীত তাহাকে অনেক পুস্তকও পাঠ করিতে হইয়াছিল। তিনি রাজবাটীতে

প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাসন্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়—অর্জ্জিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাজসরঞ্জাম কে রাখিবে? বিবাদ এই লইয়া। যে যে নাটক আমরা একত্রে অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই আমার নায়কের (Hero) ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা।”

“বিবাদ মীমাংসা হইল না, দুইটী দল হইল। দুই দলেরই ইচ্ছা মফঃস্বলে অভিনয় করে। এক দলে অর্দ্ধেন্দু, আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান,কারণ নানাস্থানে বেড়াইবার আমার শক্তি,সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৺রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয়দলের প্রকৃত পরিচালক,—৺ধর্ম্মদাস সুরও সেই দলে ছিলেন। যে দলে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও সেই দলে। অবশেষে দল-ভেদের মর্ম্ম উভয়ে অস্থিতে অস্থিতে বুঝিয়াছিলেন। দলের পরিচালক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অর্থ পিপাসায় ন্যাসন্যাল বিভক্ত হইয়া যায়, এ কথা মধ্যে মধ্যে আজও আলোচিত হইয়া থাকে।”

অর্দ্ধেন্দুশেখর যে দলের নেতা হইয়াছিলেন তিনি তাঁহার সেই দল লইয়া মফঃস্বলে নানা স্থানে অভিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনয়-প্রশংসা বঙ্গের গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িল। সাহেবের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর এক অদ্ভুত ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন। তিনি যে কয়টী সাহেবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন সেরূপ অভিনয় আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। ইদানীং লোকে অর্দ্ধেন্দুশেখর সাহেবের ভূমিকা অভিনয় করিবেন, শুনিলেই দলে দলে থিয়েটারে ছুটিয়া আসিতেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সাহেবের অভিনয় লোকের এত প্রাণে

লাগিয়াছিল যে, তাঁহার নামই সাহেব হইয়া গিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন বিদেশে বিদেশে তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া ঘুরিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার হস্তে কত সম্প্রদায় যে গঠিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার হস্তে যে সকল অভিনেতা অভিনেত্রী শিক্ষিত হইয়াছে, তাহারা তোতা পাখীর মত শুধু মুখস্থ বলিতে শেখে নাই, নাট্যকলার ভিতরেও কিছু কিছু প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। শ্রীমতী সুকুমারী (গোলাপ) যখন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করিত তখন সে কেবল তোতা পাখীর মতই অভিনয়ই করিত, নাট্যকলার ভিতরে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহার পর সে যখন বেঙ্গল থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া ন্যাসন্যাল থিয়েটারে যোগদান করিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাধীনে আসিয়াছিল তখন হইতে সে নাট্যকলার ভিতরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং অভিনয়কৌশলে দর্শকবৃন্দকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। সুবিখ্যাত অভিনেত্রী ৺কুসুমকুমারী (বিষাদ কুসুম) প্রথম হইতেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের হস্তে গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই সে নাট্যকলাবিদ্যায় একেবারে সুনিপুণা হইয়া উঠিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাপ্রদান সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের পর অর্দ্ধেন্দু বহু স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময় বহু নাট্য সম্প্রদায় তাহার দ্বারা দীক্ষিত হয়। নড়ালের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্য সম্প্রদায় গঠন অর্দ্ধেন্দুর কার্য্যের শেষ। অর্দ্ধেন্দুশেখর দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, প্রায়ই যে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত অভিনেতারা থাকিতেন তথায় যোগদান করিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কার্য্যক্ষেত্রে ও বিপুল যশোলাভ।

ইহার পর গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী হইয়া প্রতাপচাঁদ জহুরী যখন থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন, তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর কলিকাতায় ছিলেন না। তখন তিনি আবার বিদেশে ঘুরিতেছিলেন, কাজেই ন্যাসন্যাল থিয়েটারের প্রথম মুখে তিনি ন্যাসন্যাল থিয়েটারে যোগদান করিতে পারেন নাই। তখন গিরিশ বাবু ন্যাশান্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাহার পর যখন গিরিশ বাবুর সহিত প্রতাপচাঁদের সামান্য একটা কারণ লইয়া মনোমালিন্য হইল ও গিরিশবাবু ন্যাসন্যাল থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিলেন, সেই সময় প্রতাপচাঁদ ৺কেদারনাথ চৌধুরীকে থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিয়োজিত করেন। কেদার বাবু যখন ন্যাশান্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইলেন সেই সময় তিনি আবার অর্দ্ধেন্দুশেখরকে ন্যাসন্যাল থিয়েটারে লইয়া আসেন। কিন্তু কেদারবাবুর অধ্যক্ষতায় থিয়েটার অধিক দিন চলিল না। প্রতাপচাঁদ থিয়েটার তুলিয়া দিলেন। এই সময় অর্দ্ধেন্দুশেখর ন্যাসন্যাল থিয়েটারে যোগদান করিয়া কয়েকখানি নাটকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত তাহা অভিনয় করেন। এই থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর কেদারনাথের "ছত্রভঙ্গ" নাটকে শেষ অভিনয় করেন। এ সম্বন্ধে গিরিশ বাবু লিখিয়াছেন,—

"যখন ৺প্রতাপচাঁদ জহুরী গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের অধিকারী হইয়া ন্যাসন্যাল থিয়েটার নাম দিয়া আমার তত্ত্বাবধানে থিয়েটার চালান সে সময় অর্দ্ধেন্দু বিদেশে। প্রতাপচাঁদকে নূতন দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ নট ৺মহেন্দ্রলাল বসুর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে নূতন সরঞ্জাম প্রস্তুত হইল। এই সময় আমি পার্কার সাহেবের আফিস্ পরিত্যাগ করি এবং রঙ্গালয় আমার স্থান হয়। তদবধি অর্থশোষকেরা দূর হইতে দেখিতেন, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার আর উপায় রহিল না। এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের বাহিরে যথাসাধ্য আমার বিপক্ষে শত্রুতা চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। পরে নানাকারণে প্রতাপচাঁদের সহিত আমার 'অবনিবনাও' হওয়ায় ৺গুর্ম্মুখ রায়ের অর্থে ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হইল। [যথায় এক্ষণে মনোমোহন থিয়েটার বিদ্যমান, ষ্টার থিয়েটার ঐ স্থানে নির্ম্মিত হয়।] সে সময়ে প্রতাপচাঁদ ৺ কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইবার চেষ্টা করেন। অর্দ্ধেন্দুও কেদারনাথের সহিত মিলিত হন। প্রতাপচাঁদের থিয়েটার রহিল না। কেদারনাথের "ছত্রভঙ্গ" নাটক তাঁহার শেষ অভিনয়।"

ন্যাসন্যাল থিয়েটার উঠিয়া যাইবার কিছুদিন পরে যখন ধনকুবের ৺গোপাললাল শীলের মাথায় থিয়েটারের নেশা প্রবল হইয়া উঠে এবং যখন ষ্টার থিয়েটারের বাটী ক্রয় করিয়া তিনি এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময় গোপাল বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখরকে তাঁহার থিয়েটারে লইয়া আইসেন। গোপাল বাবু ৺কেদারনাথ

চৌধুরীকে তাঁহার থিয়েটারের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কেদার বাবু এমারেল্ড থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়া 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন' নামক একখানি নাটক ঐ থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য রচনা করেন। এই পাণ্ডব সির্ব্বাসন নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে ভূমিকাটী লইয়াছিলেন তাহা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ৺গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে তিনি অধিক দিন অভিনয় করেন নাই। পাণ্ডব নির্ব্বাসন নাটকের এমারেল্ড থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয় হইবার পর গোপাল বাবু গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারে লইয়া আইসেন ও কেদার বাবুর স্থানে তাঁহাকেই অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। ইহাতে কেদার বাবু বিশেষ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া পড়েন এবং এমারেল্ড থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত কেদার বাবুর বিশেষ প্রণয় ছিল। তাঁহাদের দুইজনের চেষ্টাতেই এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপিত হয়। কেদার বাবু এমারেল্ড থিয়েটার ত্যাগ করায় অর্দ্ধেন্দুশেখরও এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া দেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"কিছুদিন পরে ৺গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করেন, তখন থিয়েটার গুর্ম্মুখ রায়ের নহে, উপস্থিত ষ্টার থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারিগণের। ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় অভিনয়ার্থে ঢাকায় গমন করিল। কেদারনাথপরিচালিত গোপাললাল শীলের অর্থে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্ত্তিত ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি অভিনেতৃগণ সংমিলিত এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রথম অভিনয় কেদারনাথ বিরচিত পাণ্ডব নির্ব্বাসন নাটক; দুই চারি রজনী

অভিনয়ের পর গোপাললাল আমায় তাঁহার থিয়েটারে গ্রহণ করিলেন। কেদারনাথের পরিবর্ত্তে আমায় ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেদারনাথ চলিয়া গেলেন, অর্দ্ধেন্দুও তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।"

এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর বহুকাল আবার কোন সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন নাই। তবে তখন তাঁহার হস্তে অনেক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপন করেন, সেই সময় তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আবার থিয়েটারে লইয়া আইসেন। নাগেন্দ্র বাবুর মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিবার পর তথায় প্রথমই ম্যাক্‌বেথ নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর চারিটী ভূমিকা গ্রহণ করেন; এবং চারিটী ভূমিকাঁর অভিনয়েই তিনি যে অর্দ্ধেন্দু এ কথা প্রত্যেক দর্শককে জানাইয়া দিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যাক্‌বেথের অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছিল তাহা লিখিয়া বুঝান কঠিন। আর হইবেই বা না কেন,—যে নাটকে শ্রীমতী তিনকড়ি লেডী ম্যাক্‌বেথ, গিরিশচন্দ্র ম্যাক্‌বেথ ও চারিটী স্বতন্ত্র ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর সে নাটকের অভিনয় যে সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহা লেখাই বাহুল্য। অর্দ্ধেন্দুশেখর ম্যাক্‌বেথ-নাটকে পোর্টার, উইচ, ওল্ড ম্যান ও ডক্টর এই কয়টী ভূমিকা একই রাত্রে অভিনয় করিতেন।

ম্যাক্‌বেথ নাটকের অভিনয় হইবার কিছুদিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারে আবুহোসেন গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। এই গীতিনাট্যে

অর্দ্ধেন্দুশেখর আবুর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই আবুর ভূমিকাটীর তিনি এমন অভিনব ও মনোহর অভিনয় করিয়াছিলেন যে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই ; শুধু এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে এই আবুহোসেন গীতিনাট্যের আজও রঙ্গালয়ে অভিনয় হইতেছে, বহু স্বনামখ্যাত অভিনেতা এই ভূমিকাটীর অভিনয় বহুবার করিয়াছেন, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর এই আবুহোসেন গীতিনাট্যে যে প্রাণ দিয়াছিলেন সে প্রাণটুকু কেহই দিতে পারিলেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখনই যে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন তখনই যেন তিনি অর্দ্ধেন্দু হইয়া বাহির হইতেন। সে অভিনয় অনুকরণ করিতে আজ পর্য্যন্ত কোন অভিনেতাই পারিল না। আবুহোসেন গীতিনাট্যের অভিনয়ের পর মুকুলমুঞ্জরা নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর বরুণচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই ভূমিকার অভিনয়ে বেশ নূতনত্ব দেখাইয়া দেন। তাহার পর জনা নাটকে তিনি বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন ও অভিনয়কলার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"পরে যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্দ্ধেন্দু পুনরায় একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করেন। মিনার্ভায় প্রথম অভিনয় ম্যাক্‌বেথ—ইহাতে অর্দ্ধেন্দু পোর্টার, উইচ, ওল্ড ম্যান ও ডক্টর এই চারিটী অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেন প্রহসনে আবুহোসেন,

মুকুলমুঞ্জরায় বরুণচাঁদ, জনায় বিদূষক প্রভৃতির অভিনয়দক্ষতায় নব শ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক নাট্যোমোদীর মুখে অর্দ্ধেন্দুর ভূয়সী ব্যাখ্যা।"

অর্দ্ধেন্দুশেখর বড় খেয়ালী লোক ছিলেন, তাঁহার মেজাজ ঠিক আমিরের মত ছিল। যেখানে দুই টাকা ব্যয় করিলে যথেষ্ট হইত সেখানে তিনি পাঁচ টাকা ব্যয় করিতেন। লোকে তাঁহার নিকট খাইতে চাহিলে তাঁহায় আর আনন্দ ধরিত না, তিনি সব ভুলিয়া কেমন করিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভূরি ভোজন করাইবেন সেই ভাবনায় একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন। এত বড় মহৎ প্রাণ—এত বড় উচ্চ মেজাজ কয়জনের দেখিতে পাওয়া যায়! তাঁহার আর এক গুণ ছিল তিনি নাট্যকারগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। আজকাল যেমন নাট্যকারগণ একখানি নাটক লিখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের হস্তে অর্পণ করিয়া আসিয়া ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার নাটকখানি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে পড়াইতেও পারেন না; অর্দ্ধেন্দুর আমলে তাহা হইত না, তাঁহার নিকট কোন নাটককার কোন নাটক দিলে তিনি তখনই সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া সেই নাটকখানি শুনিতে বসিতেন এবং যে নাটকখানি থিয়েটারে অভিনীত হইতে পারে না, কিরূপ হইলে নাটকখানি অভিনয় করিবার উপযোগী হয় তাহা তিনি সেই গ্রন্থকারকে অতি সুন্দর ভাবে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অর্দ্ধেন্দু-শেখর বড় খেয়ালী লোক ছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যখন তিনি জনা নাটকে বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করিতেছিলেন সেই সময়

৺গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া দিবার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার অমনি খেয়াল হইল তিনি স্বয়ং সত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজেও নিজেকে কোন দিনই ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না, একবার যদি তাঁহার প্রাণে কোনরূপ খেয়াল উঠিত তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। যেমন তাঁহার প্রাণে খেয়াল উঠিল তিনি সত্বাধিকারী হইয়া নিজেই থিয়েটার চালাইবেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লওয়া স্থির হইয়া গেল এবং তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া এমারেল্ড থিয়েটারের সত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্যের অভাব ছিল না, তাঁহার অনেক শিষ্য তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। মহাসমারোহে এমারেল্ড থিয়েটার চলিতে লাগিল। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিষয়বুদ্ধি একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। টাকা কেমন করিয়া রাখিতে হয়,—বুঝিয়া সুঝিয়া কেমন করিয়া ব্যয় করিতে হয়, এ বিদ্যা তাঁহার আদৌ জানা ছিল না। তিনি জানিতেন কেবল টাকা ব্যয় করিতে, কেমন করিয়া টাকা ব্যয় করিতে হয়—অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট হইতে তাহা শিখিবার জিনিষ ছিল। যাহার কাছে টাকার কোন মূল্য নাই তিনি কি কোন দিন ব্যবসায়ী হইতে পারেন, না কোন ব্যবসায় জমাইতে পারেন! অর্দ্ধেন্দুশেখরেরও ব্যবসায় তেমন চলিল না,—কিছুদিন পরেই তাহা বন্ধ হইয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুশেখরের থিয়েটারের নিয়মও ছিল

কঠিন,—নেপথ্য হইতে অভিনয়ে যদি কোন গোলযোগ বা চীৎকারের আবশ্যক হইত তাহা হইলে প্রত্যেক অভিনেতাকে চীৎকার করিতে হইত তা তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"জনায় বিদূষক দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি (অর্দ্ধেন্দু) স্বয়ং সত্ত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন—এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন। কতকগুলি অভিনেতাও তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এইটী অর্দ্ধেন্দু জীবনে একটী ভ্রম! তিনি অভিনেতা ছিলেন,—বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক্ সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয় তাহা জানিতেন না। যথা, নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন। বড় বড় অংশ যাহাতে সার্ব্বাঙ্গীন পুষ্ট হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে তাহারই জন্য বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলেও তিনি বিরক্ত,—ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনরূপে শিখিতেছে না,—অর্দ্ধেন্দু তাহাকে শিখাইবেই। যদি কোন অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, সকল ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ শিক্ষাদান প্রশংসার হইত, কিন্তু রঙ্গালয়কার্য্য চালাইতে হইবে, অভিনয় রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা

তিনি শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন,—নিখুঁত না হইলে কোন অভিনেতার নিস্তার নাই। এরূপ কার্য্যের ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া অতি-অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার নানারূপ কার্য্যের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, এ নিমিত্ত ঋণ গ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।

কবি নট চিত্রকর প্রভৃতির প্রায়ই বিষয় বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিঘ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা হিসাবের এক পয়সার জন্য বাদানুবাদ করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাবধি খাতা উল্টাইয়া রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচা মিলাইবার জন্য তিনদিন মস্তিষ্ক খাটাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করেন না। কিন্তু নট প্রভৃতি যাঁহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন, তাঁহাদের বিষয়কর্ম্মের ভিতর একমাত্র আহারের চিন্তা থাকে, তাহা পূর্ণ হইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন, বিষয়ীর সংসর্গ তাঁহাদের একেবারেই বিরক্তিকর। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি অর্দ্ধেন্দু থিয়েটারের জন্য আত্মীয়ের বিদ্বেষ উপেক্ষা করিতেন, বাড়াঘর পুত্র কিছুরই তোয়াক্কা রাখিতেন না। তাঁহার আহার্য কার্য্যটী চলিলেই হইল। তাহার পর যাহা হউক না কেন, তিনি থিয়েটার লইয়াই থাকিতেন। 'কখনও বা যত্নপূর্ব্বক কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও বা নাটকের অংশ লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, কখনও কোন

চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছেন, কখনও বা কোথায় কিরূপে কোন নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, কখনও বা কোন নাটককার স্বরচিত নাটক লইয়া আসিয়াছে তাহা শুনিতেছেন, শ্রোতারা যখন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চলিয়া গেল, অর্দ্ধেন্দু অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, হয়তো গ্রন্থকার পড়িতে ক্লান্ত, কিন্তু অশ্রান্ত অর্দ্ধেন্দু "পড়ে" যাও ভাই" বলিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে থিয়েটারে আর কেহ কোথায় নাই, এক চেয়ারে গ্রন্থকার অপর চেয়ারে অটল অচল অর্দ্ধেন্দু, বিরক্তির লেশ মাত্র মুখে অঙ্কিত নাই।' উপর্য্যুপরি কত দিন পর্য্যন্ত গ্রন্থপাঠ করিয়াও অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। গ্রন্থকারের পাঠ করা শেষ হইয়াছে, এইবার তাঁর বড় বিপদ। অর্দ্ধেন্দু তাঁহার প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন। সে নিজ চরিত্রসম্বন্ধে বুঝুক না বুঝুক অর্দ্ধেন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতেছেন। যদি কোন নাটককার দুর্দ্দৈব বশতঃ বলিত যে আমার তো এরূপ লেখা নাই, অর্দ্ধেন্দু বলিত খোল ভাই তোমার খাতা খোল। গ্রন্থকারকে খাতা খুলিতেই হইবে, এবারের পরে আরও বিপদ, তাহার আশঙ্কা আবার অন্যান্য স্থান খুলিতে বলিবেন, তাহা হইলে আজ আর তাঁহার বাড়ী ফেরা হইবে না। যদি কেহ অর্দ্ধেন্দুকে বলিল "মশাই ওসব কি করেন?" অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর হইয়া বলিতেন, আমরা না শুনিলে উহারা শিক্ষা পাইবে কোথায়? কোন রং চংয়ের কথা যে কেহ যে সময়

শুনিতে চাহিত, অর্দ্ধেন্দু তখনই শুনাইতে প্রস্তুত, দ্বিতীয় বার অনুরোধ করিতে হইত না। রঙ্গরস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু এ সম্বন্ধে সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন। যথায় বসিতেন, আনন্দের স্রোত চলিত, কিন্তু রিহারস্তালে বসিলে অভিনেতা অভিনেত্রীর সর্ব্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এক কোণে কেহ কাহার নিকট একটী কথা বলিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেই দিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন, তাহাকে কহিলেন, "থাম, বাবুদের কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, আগে শেষ হউক, তাহার পর কার্য্য হইবে।" কেহ উঠিয়া গেলে, পায়ের শব্দ হইয়াছে, অমনি ছাত্রগণকে "বলিলেন, স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া যাইবেন যান, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কার্য্য আরম্ভ করি।" তাঁহার শিক্ষাপ্রদানে এতদূর আগ্রহ ছিল, যে সামান্য বাধা বিঘ্নেও চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু রিহার্স্যাল ফুরাইলে অতি ক্ষুদ্র অভিনেতাও তাঁহার বন্ধু। বন্ধুভাবে একত্র কথাবার্ত্তা, ভোজের আয়োজন, রন্ধনে উপদেশ প্রদান, এইরূপে বারমাসের মধ্যে একাদশ মাস কাটিয়া যাইত। অর্দ্ধেন্দুর থিয়েটারের নিয়মাবলীও কঠিন ছিল। অভিনয়ে নেপথ্যে সৈন্যগণের "আল্লা-আল্লা হো" শব্দ করিবার আবশ্যকতা। নেপথ্যে দুই একজন মাত্র "আল্লা হো আকবার" করে, তাহাতে জমাই হয় না। অর্দ্ধেন্দু নিয়ম করিলেন, যখন "আল্লা আল্লা হো" করিবার নেপথ্যে প্রয়োজন হইবে, তখন যে যেখানে থিয়েটারে যে অবস্থায় থাকিবে একবার আল্লা হো শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই সকলকেই "আল্লা আল্লা হো"

শব্দ করিতে হইবে। কেহ হুকা হাতে করিয়া আল্লা আল্লা হো করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া আল্লা আল্লা হো করিতেছে, আবার জলের গ্লাস হাতে বা বেঞ্চিতে শুইয়া একটু তন্দ্রাবস্থায়, কেহ বা পাইখানায়—সেই অবস্থায়ই "আল্লা আল্লা হো" করিতে হইবে, কেননা সাহেব দিব্বি দিয়াছেন।

অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অসীম দয়া ছিল। প্রয়োজন হইলে যে স্থলে আমরা দুই টাকা যথেষ্ট মনে করিতাম, অর্দ্ধেন্দু পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ খাইতে চাহিলে যেরূপে পারেন তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইতেন। সামাজিকতায় অর্দ্ধেন্দু আমীর অপেক্ষা অধিক ছিলেন।"

বাঙ্গালাদেশে অভিনয় করিয়া অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুখ্যাতি অপর কোন অভিনেতার ভাগ্যে বড় ঘটে নাই। তাহার ভিতরে ঈশ্বর-প্রদত্ত এমন একটা জিনিস ছিল যে তিনি একাই একশো ছিলেন। তাঁহার ভিতরে যে শক্তি ছিল, তিনি ভগবৎপ্রদত্ত যে অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশীয় থিয়েটার তাঁহাকে সে সম্মান প্রদান করিতে পারে নাই। বিলাত ও আমেরিকার মত এখানে যদি ভ্যারাইটী থিয়েটারের আদর থাকিত তাহা হইলে একাকী অর্দ্ধেন্দুর দ্বারাই একটী নাট্যশালা চলিতে পারিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এটা বিলাত নয় বাঙ্গালা দেশ, কাজেই অর্দ্ধেন্দুর সে সম্মান এখানে হয় নাই। তবুও তিনি যে সম্মান পাইয়াছিলেন তাহাও অত্যল্প অভিনেতার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুর যশ যে কেবল বঙ্গদেশব্যাপ্ত তাহা নহে। ভারত-

বর্ষে যেখানে দশজন বাঙ্গালী বসিয়া নাটকের কথা হয় সেইখানেই অর্দ্ধেন্দুর নাম প্রচার। সকলেই তাহাকে অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া জানেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য সেরূপ প্রসন্ন ছিল না, সে বাঙ্গালার ভাগ্য, কেবল অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য নহে। ভ্যারাইটী থিয়েটার, অর্থাৎ যে স্থলে নানাবিধ রসের কৌতুক-আলাপ হইয়া থাকে এরূপ থিয়েটারের দর্শক বাঙ্গালায় যথেষ্ট নাই। এরূপ দর্শক থাকিলে অর্দ্ধেন্দু একা অল্প সাহায্য লইয়া দেবকার্সনের ন্যায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। উপস্থিত হাব ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিদ্যাবিশারদ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

দর্শকগণ অর্দ্ধেন্দুকে অর্দ্ধেন্দুই দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দুর এমন কতকগুলি জিনিষ নিজস্ব ছিল, যাহা অনুকরণ হইবারই নহে। সে বিশেষত্বটুকু কেবল অর্দ্ধেন্দুতেই সম্ভব ছিল। অর্দ্ধেন্দু যে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন তাহাতে এমন একটী বিশেষত্ব দিতেন যাহা শত চেষ্টায়ও অন্যের দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হইত না। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীলদর্পণে "গোলক বসুর' অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও 'অর্দ্ধেন্দুবী' একটু টিপ্পনী আছে। চাষা হা করিয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটী মশা মারিল, এটী "অর্দ্ধেন্দুবী।" "বুড়া উড্" সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট। "আবুহোসেনে" সখীদের সহিত পীঠবস্ত্র ঘাঘরার ঢংয়ে দাঁড়াইয়া সখীভাবে নৃত্য, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে

গদা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া, ষ্টেজের কাহারও সাজিয়া বাহির হইতে দেরি হইতেছে বলিয়া নাটকের কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া, লীলাবতীতে হরবিলাস বসিয়া আছে (কাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে আমার স্মরণ হইতেছে না) অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, "জমাদার সাহেব তোমার আসামী সটকেছে,— এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হয়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক, (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব বসে আছেন।" এ সমস্ত কাহার বিসদৃশ লাগিত! অপর কেহ করিলে যে বিসদৃশ লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্তই ঢাকিয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই। ইহা কলা বিদ্যাগার- স্বভাব নয়।"

অর্দ্ধেন্দুর আর এক গুণ ছিল, তিনি অভিনয় করিতে করিতে এমন এক একটী কথা অভিনয়ের ভিতর যোগ করিয়া দিতেন যে তাহাতে দর্শকগণ বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। অভিনয়ের ভিতর ভাবসামঞ্জস্য রাখিয়া মাপসই দুই চারিটী কথা ঠিক সামায়িক বলা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। অর্দ্ধেন্দুর পরে যদি অপর কোন অভিনেতা এইরূপ করিতেন তাহা হইলে তাহা দর্শকের কর্ণে একেবারেই বিকট ঠেকিত, কিন্তু অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুর অসীম প্রতিভা ছিল কাজেই তিনি যাহাই করিতেন তাহাই মানাইয়া যাইত, কারণ অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দুই দেখিতেন, তিনি কোন ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন সে কথা কেহই বড় বিচার করিতেন

না। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজের কথা অভিনয়ের ভিতর প্রকাশ করাইয়া দিতেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুর আর একটী শক্তি ছিল, অভিনয় কালে নাটকের কথায় নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত কথা উপস্থিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন,—যথা, মুকুলমুঞ্জুরায় বরুণচাঁদের ভূমিকায় বরুণচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া রাজা যখন বলিতেছে—"এ কে ভাঁড় নাকি ?" তখন অর্দ্ধেন্দু বরুণচাঁদ উত্তর করিল,—"মহারাজ ভাঁড়—অত বড় নই—আমি একখানি খুরী।" ইহা নাটকের কথা নহে, কিন্তু শ্রবণমাত্র যে হাস্যের রোল উঠিল তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন। সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে এস্থলে অনুকরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া তাহার মত ঢং করিতে গেলে ভাঁড়াম হইয়া উঠে।"

অর্দ্ধেন্দু যে শুধু হাস্যরস অভিনয় করিতেই পটু ছিলেন তাহা নহে, তিনি সুগভীর ভূমিকা অভিনয়েও কম পটু ছিলেন না। হাস্যরস অভিনয়ে যেমন তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল গম্ভীর ভূমিকা অভিনয় করিতেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুকে দর্শকগন অর্দ্ধেন্দুই দেখিতেন, সেই কারণ তাঁহার গম্ভীর ভূমিকার সৌন্দর্য্য তাঁহারা সহজে ধরিতে পারিতেন না। অর্দ্ধেন্দু আসিয়াছে, কাজেই হাসিতে হইবে, সেইজন্য কি ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা তাঁহারা একবারের জন্যও চিন্তা বা বিবেচনা না করিয়াই হাসিয়া আকুল হইতেন। কাজেই গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়ে তাঁহার তেমন নাম ছিল না। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিলাম তাহা হাস্যরস সম্বন্ধে। গম্ভীর ভূমিকা অভিনয়েও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল, কিন্তু গম্ভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্য্য ধরিতে পারিতেন না। অবশ্যই সে ভূমিকার পরে প্রকৃত পরিচয় পাইয়া যেরূপ হাস্যরসাত্মক অংশে হাসিতেন, করুণরসাত্মক অংশেও কাঁদিতেন।"

অর্দ্ধেন্দুর স্বদেশানুরাগ বড় কম ছিল না। তিনি দেশকে সত্যই প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। 'ভারতমাতা' প্রভৃতি পুস্তক কেবল তাঁহারই জেদে থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রঙ্গমঞ্চ হইতে সমাজকে অনেক শিক্ষা দেওয়া যায়,—অনেক সৎপ্রবৃত্তি রঙ্গালয় হইতে মানুষের মনে জাগাইয়া দিতে পারে। তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে, রঙ্গ-মঞ্চের কাজ দেশের কাজ,—সে কাজে তিনি কিছুতেই অবহেলা করিতে পারেন না।

তিনি যে সদ্‌গুণও প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু সম্পূর্ণ বিকাশিত হয় নাই, উহার যে কারণ ছিল না তাহা নহে। তাঁহার প্রাণে এক মহাদুর্ব্বলতা ছিল, যে কেহ তাঁহাকে একটু যত্ন করিত,—আত্মীয় হইবার চেষ্টা করিত, সেই তাঁহার আত্মীয় হইতে পারিত এবং তাহারই কথা তাঁহার নিকট অকাট্য সত্য হইয়া দাঁড়াইত। সেই সকল স্বকার্য্যসিদ্ধকারী সুহৃদ্‌বর্গে তিনি চির জীবনটা বেষ্টিত ছিলেন, এবং তাহাদের কথায় এমনভাবে নাচিতেন যে নিজের ক্ষতির দিকে একবারও

লইয়া নূতন দল বসাইবার প্রয়াস পাইত। এরূপ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রতিবারেই শেষে অর্দ্ধেন্দু বুঝিতেন,—কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল হয় নাই, আবার তাহাই হইত। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার রঙ্গমঞ্চে মিলন হইবার পর সুহৃদ্‌ভেদকারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতেন না। ইহাতে বহুবিধ কষ্ট পাইয়াছেন,—তাঁহার গুণ বিকাশে বিস্তর বাধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দৈববিড়ম্বনা।”

অর্দ্ধেন্দুর প্রাণটা ছিল যেমনই উদার তেমনি সরল। তিনি সকলকেই নিজের মত ভাবিতেন। কাজেই তাঁহাকে পদে পদে ঠকিতে হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্র।

অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র এই দুইজনের ভিতর কে বড় এই লইয়া নাকি কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন। কাহার কাহার নাকি বিশ্বাস অভিনেতা হিসাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড়। ইহাও নাকি কেহ কেহ বলেন সেই কারণে গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভার হিংসা করতেন এবং যাহাতে অর্দ্ধেন্দু-শেখরের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিতে না পারে সে জন্য তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। এ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে

পারি না। তবে আমাদের মনে হয় এ-কথার মূলে কোনই সত্য নাই, গিরিশ বাবুর ন্যায় লোকের পক্ষে এতটা হীন হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। যিনি থিয়েটারের জন্য জীবন দিয়া গিয়াছেন,—অভিনেতা অভিনেত্রী যাঁহার প্রাণছিল, তিনি কি কখন এত নীচ হইতে পারেন? অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভা যাহাতে ফুটিয়া উঠে, আমরা জানি, গিরিশচন্দ্র চিরদিন সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে যে তিনি কখন বাধা দিয়াছেন, এ কথা আমরা কখনও শুনি নাই। অনেক সময় দুঃখ করিয়া গিরিশচন্দ্রকেই আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, "অর্দ্ধেন্দু লোকের কথায় নাচিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিতেছেন।" ইহা হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভা বিকসিত হইবার কোন দিনই অন্তরায় ছিলেন না। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র একস্থানে স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"কাহার কাহার ধারণা আমরা উভয়ে উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্দ্ধেন্দুর একই কথায় দূর হইবে। অর্দ্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন যে, 'গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে তাহা হইলে আমি ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আর আমি যদি আগে মরি সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই।' আমরা অনেক সময়ে একত্র ও অনেক সময়ে বিরোধী থিয়েটারে কার্য্য করিতাম। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ যিনি থাকুন,—যিনিই যত তাঁহার প্রশংসা করুন, যিনি যতই অন্তর হইতে বলুন যে, অর্দ্ধেন্দু স্বর্গগত হওয়ায় বঙ্গরঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহাদের অপেক্ষা যদি বেশী

না হই, অন্ততঃ আমি তাঁহাদের সমান অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ,—এ কথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি।"

উপরিলিখিত গিরিশচন্দ্রের লেখাটুকু হইতেই অনায়াসে প্রমাণ হইতে পারে যে গিরিশচন্দ্রের সহিত অর্দ্ধেন্দুশেখরের কি এক অবিচ্ছেদ্য আন্তরিক ভাববন্ধন ছিল। তবে অভিনয়সম্বন্ধে কে বড় সে কথা লেখাই বাহুল্য। তাহার কারণ অর্দ্ধেন্দুশেখরকেও গিরিশচন্দ্রের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইয়াছিল, এ কথা অর্দ্ধেন্দুর নিজের মুখে আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় অভিনেতা বড় একটা জন্মগ্রহণ করে না বটে, কিন্তু তা বলিয়া তিনি গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন না। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের প্রথম মহালা হয় তখন উইচএর ভূমিকা অর্দ্ধেন্দুশেখর যে ভাবে আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহা ঠিক হইতেছিল না। এই উইচএর ভূমিকার কিরূপ ঠিক আবৃত্তি হইবে গিরিশচন্দ্র তাহা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে কতবার দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রথমে কিছুতেই সেরূপ করিতে পারিতেছিলেন না, গিরিশচন্দ্রের আবৃত্তি এত সুন্দর হইয়াছিল যে তাহা অননুকরণীয়। নূতন অভিনয়ের মহালায় এরূপ অনেক সময়ই হইয়াছে। নব ভাবোদ্ভাবনে ও উহার প্রয়োগে গিরিশপ্রতিভা অদ্বিতীয়। কাযে ইহা হইতেই বেশ জানিতে পারা যায় যে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্থান গিরিশচন্দ্রের নিম্নে, উপরে তো নহেই। বিশ্বকোষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে রাজবাটীর অভিনয় দেখিয়াই অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এ কথা

আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা জানি রাজবাটীর অভিনয় দেখা ব্যতীতও অর্দ্ধেন্দুকে অনেক শিখিতে হইয়াছিল, রঙ্গালয়ে প্রবেশ লাভের পর তাঁহার গিরিশচন্দ্রের নিকটও অনেক শিক্ষা লাভ করিতে হইয়াছিল। যদি কেবল রাজবাটীর অভিনয় দেখিয়াই অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়শিক্ষার শেষ হইত তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, তিনি কখনই অর্দ্ধেন্দু হইতে পারিতেন না। অভিনয়কলা বড় সোজা বিদ্যা নহে,—শুধু দেখিয়া মানুষে কখনও এ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না, রীতিমত শিক্ষা ও প্রাণের সাধনার প্রয়োজন। অর্দ্ধেন্দুশেখর সে শিক্ষা, সে সাধনা, করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহার এত সম্মান—তাই তিনি অর্দ্ধেন্দু। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গিরিশচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন,

"বিশ্বকোষে লিখিত আছে যে, এই অভিনয় (রাজবাটীর) দৃষ্টে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়—দেখিবার, জানিবার, শিখিবার আর কিছু বাকি রহিল না। এ স্থলে "বিশ্বকোষ" ভ্রান্ত। পাথুরিয়াঘাটা রাজ বাড়ীর "মালবিকাগ্নি মিত্র", বিদ্যা সুন্দর, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল", "বুঝলে কিনা!", "মালতী মাধব", 'উভয় সঙ্কট', "চক্ষুদান", "রুক্মিণী হরণ", "রসাবিষ্কারবৃন্দক" ও জোড়া সাঁকোর "নব নাটক" দেখিয়া নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা যিনি নটের শিক্ষার কি প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন, তিনি তাহা কাগজে লিখিবেন না। নটের কার্য্য 'To give to airy nothing a local habitation and a name' অর্থাৎ বায়ু নির্ম্মিত আকাশ-

কুসুমতে নাম ও ধাম দেওয়া নটের কার্য্য। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্রের উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহ্য ও আন্তরিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে নট তাহা বুঝিতে পারে না। "বিশ্ব-কোষ"-উল্লিখিত শিক্ষা ব্যতীতও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপর শিক্ষার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। কেবল পুস্তকপাঠ বা শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে চরিত্র বর্ণনা শুনিলে অর্দ্ধেন্দু কদাচ প্রশংসাভাজন হইতেন না। ম্যাকবেথের উইচ প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্য্য নহে।

স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও বিশেষপ্রয়োজন আছে। আন্তরিক ও বাহ্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে তাহা নট বুঝিতে পারে না।"

নটের কল্পনা যে সামান্য নহে তাহা বহু দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করা যায়। নাটকের চরিত্র লইয়া নট তচ্চরিত্র-প্রস্ফুটনে কিরূপ পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে উপযুক্ত হইবে ও শিল্প-দ্বারা নিজ অবয়বে কিরূপ পরিবর্ত্তনই বা আবশ্যক তাহা দর্পণ-সাহায্যে স্থির করেন। চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করাতেই অভি-নেতার কার্য্যের অবসান হয় না। তাঁহার অবয়ব স্বেচ্ছানুসারে চালিত হওয়া চাই। শুনা যায় জগদ্-বিখ্যাত অভিনেতা সার হেনরী আরভিং ফরাসী মন্ত্রী "রিশ্‌লুর" ভূমিকার অভিনয়ে রাজার সম্মুখে নিজ মৃত্যু যেন আসন্ন দেখাইতেন। কিন্তু রাজা রিশ্‌লুকে মার্জ্জনা করিয়া চলিয়া যাইবার পরেই শত্রুদমনোৎসুক

আরভিংরিশলু ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইতেন। সংবাদপত্রপাঠে জানা যায় ভারতের সীমান্তযুদ্ধে (চিত্রল সমরে) আর্‌ভিং দেখিতে আসিয়াছিলেন কিরূপে গুলির আঘাতে সতেজ সৈনিক মৃত হইয়া পড়ে। তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও সে সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই;—তাহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল বীরমদোজ্জ্বল মুখমণ্ডল কি প্রকারে সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ও তাহাতে মৃত্যুর ছায়া পতিত হয়। দেহের উপর এরূপ আধিপত্যলাভ অল্প আয়াসের কার্য্য নহে। কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা, চরিত্রের অনুরূপ কথা কওয়া, তাহার হাব ভাব আনা নটের অতি কঠোর সাধনা। কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব-জ্ঞাপক নহে। সৈনিক পুরুষ কথা কহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারিমুখে ব্যূহরচনা চিত্রিত করিতেছে; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলিভঙ্গীতে মালা গাঁথে; কেরাণী কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে অঙ্গুলি দিয়া কি লেখে; প্রেমিক মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সুন্দর বস্তু দেখিয়া অন্যমনা হয়; বেদিয়া চলিতে চলিতে ডিগবাজী খায়; গায়ক শিস দেন, বাজিয়ে অঙ্গ বাজান—এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেন অভিনয় কালে এই সব ভাবভঙ্গী স্বভাবপ্রসূত বলিয়া দর্শক মনে করেন।”

উপরি উদ্ধৃত গিরিশচন্দ্রের এই বিবৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষা ও সাধনা কম ছিল না। তা ছাড়া আমরা জানি ও শুনিয়াছি যে গিরিশচন্দ্রের নিকট হইতেও অর্দ্ধেন্দুশেখর অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর

নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের ভিতর অনেকেরই বিশ্বাস,—শিক্ষকতায় অর্দ্ধেন্দুশেখর গিরিচন্দ্রের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। অর্দ্ধেন্দু-শেখরের শোকসভায় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও এই কথারই পোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিল্বমঙ্গলের শিক্ষা অর্দ্ধেন্দু-শেখর যাহা দিয়াছিলেন তাহা গিরিশচন্দ্রের অপেক্ষা অনেক ভাল। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় বিল্বমঙ্গলের ভূমিকার অভিনয় ভাল হইয়াছিল কি অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় বিল্বমঙ্গলের ভূমিকা ভাল ফুটিয়াছিল সে কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"নটশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার প্রশংসাকথনে রায় মহাশয় (দ্বিজেন্দ্রলাল) অর্দ্ধেন্দুর শোক-সভায় 'বিল্বমঙ্গল' নাটক হইতে একটী দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থানে চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে,—"তুমি অতি সুন্দর,—অতি সুন্দর!" পূর্ব্বে একজন অভিনেতা, এই 'অতি সুন্দর,—অতি সুন্দর' ছত্রটী উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুকর্ত্তৃক শিক্ষিত নট এই স্থলে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্ন-কণ্ঠ করিয়া আনিতেন। রায় মহাশয় বলেন অর্দ্ধেন্দু-কৃত এই পরিবর্ত্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমি বিনীতভাবে বলিতেছি, তাঁহার এই মতের সহিত আমার সম্পূর্ণ অনৈক্য আছে। রায়মহাশয় বলেন যে উত্তোরত্তর চাৎকারে কামভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু ক্রমে নিম্নকণ্ঠে বলিলে কামভাব-বর্জ্জিত হয়, সেইজন্য দ্বিতীয় প্রকারের অভিনয় তাঁহার চক্ষে সুন্দর।

আমার মতে এই স্থলে কামভাব প্রকাশই নটের উচিত। ক্রমে কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করিলে প্রদর্শিত হয় যে সরলহৃদয় কুহকিনীর রূপজালে জড়িত হইয়াছে। সেই মায়াজাল ছিন্ন করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম "অতি সুন্দর" আছে—'নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও' এই কথার পরে। দ্বিতীয় বারে আছে "চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! তৃতীয়বারে এইরূপ 'নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী, কিন্তু অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!' বিল্বমঙ্গল 'অতি সুন্দর' বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা করিতেছে না, বলিতেছে— এ রাক্ষসীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু ঘৃণিত। কামদৃষ্টিতে সুন্দর, কিন্তু বস্তুতঃ রাক্ষসীর রূপ। কণ্ঠস্বর ক্রমে নিম্ন করিয়া আনিলে প্রকাশ পাইত, অতিসুন্দররূপ-দর্শনে রূপের পূজা অন্তরে বিকাশ পাইয়াছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের রূপপূজা করিবার অবস্থা নহে। এতদিন সে পূজা করিয়াছে, কিন্তু এখন সে ঘৃণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি করিলে সে অবস্থা প্রকাশ পায়। কামশূন্য রূপপূজা সাধনার চরম—যে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিল্বমঙ্গল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দর্শনে 'আহা!' বলিয়াছিলেন। কামভাব প্রকাশ হওয়াতে বিল্বমঙ্গল ছোট হয় না। কাম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ভাবের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব—মধুরভাব লাভ হয়। বৃন্দাবনে গোপীদিগের এইভাব লাভ হইয়াছিল। কামই শ্রীরাধার অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের জনক। রায়মহাশয় বক্তৃতায় বিদ্যাপতি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়া কবির প্রশংসা করেন,

তাহার ভাব কামজনিত এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত। শুনিতে পাই বিল্বমঙ্গলের এই স্থল নিম্ন সুরে অভিনয় করাতে খুব করতালি পড়িয়াছিল। উচ্চৈঃস্বরে অভিনয় করিলে যদি করতালি না পড়ে, আর নিম্নস্বরে ঘন করতালি পড়িতে থাকে, তবে প্রকৃত নটের তাহা উপেক্ষা করা উচিত। * * * * * * * বিল্বমঙ্গলের উক্ত অংশ অভিনয়ে হয়ত কথিত প্রকার উত্তরোত্তর নিম্ন সুরে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয়, কিন্তু তাহাতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না। নাটকেও পরে প্রকাশ আছে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াও কামের হাত এড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং স্থানীয় একটু মাধুর্য্যের অনুরোধে চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা নটের কর্ত্তব্য নহে। কবি বলেন,—

It is not an eye or a lip we beauty call.
But the joint result and the full force of all,

অর্থাৎ কোন সুন্দর চক্ষু বা সুন্দর ওষ্ঠ থাকিলে যে সুন্দর হয় তাহা নহে,—সমস্ত অঙ্গের সুসম্মিলন দেখিয়াই আমরা সুন্দর বলি।"

অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় গিরিশচন্দ্র যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত দিয়াছিলেন। কাহার কাহার মতে "গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসার ছলে নিন্দাই করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখরকে কোন দিনই দেখিতে পারিতেন, না—

শেষে তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার শোক সভায় প্রশংসার ছলে নিন্দাই করিয়াছিলেন।" কিন্তু একথা একেবারেই ঠিক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। অভিনেতা অভিনেত্রীর কথা উঠিলেই তিনি সর্ব্বাগ্রে অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাম করিতেন। সেই গিরিশচন্দ্র কখনও কি অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিন্দা করিতে পারেন? না কখনই না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় প্রবন্ধপাঠ করিবার পর যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধে লোকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই,—তিনি প্রশংসাবচনে অর্দ্ধেন্দুশেখরের কেবল নিন্দাই করিয়াছেন, তখন তিনি যেরূপ প্রাণে আঘাত পাইয়াছিলেন সেরূপ আঘাত বড় একটা তিনি জীবনে পান নাই। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গিরিশচন্দ্র লিখিতেছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় বুঝিয়াছিলাম, যে মৎকর্ত্তৃক অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসা কেহ কেহ প্রচ্ছন্ননিন্দা জ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা আমি যেরূপ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় বর্ণনা করিয়াছি তাহা প্রকৃত নয়। তাঁহাদের এরূপ ধারণা বোধ হয় আমার দোষেই হইয়া থাকিবে,—বুঝি বা তাঁহাদের মস্তিষ্কের উপযোগী ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহারা বলিতে চান যে যখন অর্দ্ধেন্দু তাঁহার ভূমিকা লইয়া তন্ময় হইতেন, তখন তিনি আদৌ অর্দ্ধেন্দু থাকিতেন না। যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত যে ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না, তাহা হইলে তাহারা এরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। মদ খাইয়া মাতাল নাৎলামোতে

তন্ময় হয়, কিন্তু সে মাতাল মাতালের অভিনয় করিতে পারে না। নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন,—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপরখণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কি না,—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না, প্রতিযোগী অভিনেতা (Co-actor) ঠিক চলিতেছে কি না। যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কি না,—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা ? এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশে অভিনয় চলে সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে কখন কখন সাক্ষী-অংশ আরও বেশী হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশী থাকিত। একটী প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেছি,—অর্দ্ধেন্দুর পক্ষপাতী জনৈক অভিনেতার নিকট শুনিয়াছি। কোন এক ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু "হরে চাকরকে" ডাকিলে জনৈক দর্শক উত্তর দিল, "আজ্ঞে যাই।" অর্দ্ধেন্দুশেখর তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"ও শুওটা, তুমি ওইখানে ব'সে আছ"—এ উত্তর অর্দ্ধেন্দুর মনের সাক্ষী অংশ দিয়াছিল—তন্ময় অংশ নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধেন্দুর প্রত্যেক অভিনয় হইতেই দেওয়া যাইতে পারে। অন্য অভিনেতার পক্ষে এরূপ রহস্যকরণ দোষের হইত, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর এরূপ অসাধারণ অর্দ্ধেন্দুত্ব অনেক সময়েই দোষের না হইয়া গুণের হইত—কারণ

অর্দ্ধেন্দুকে লোকে অর্দ্ধেন্দু দেখিতে ভাল বাসিত। অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি এখানে যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম তাহা যদি আমার অপর পক্ষ না বুঝেন তবে তাঁহারা অভিনয় বিষয়ে কিছু পাঠ করিবেন অন্ততঃ 'Recent Actors' নামক পুস্তকে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা প্রশংসা—প্রচ্ছন্ন নিন্দা নয়।"

অনেকে বলেন আজকাল বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে দুইটী প্রথায় অভিনয় হয়, একটী অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপরটী গিরিশচন্দ্রের। তাঁহাদের মতে অর্দ্ধেন্দুর পদ্ধতিই স্বাভাবিক, গিরিশচন্দ্রের পদ্ধতিতে বড়ই সুরের আধিক্য। এ বিষয়ে আমরা বিশেষ কোন কথা বলিতে চাহি না, গিরিশচন্দ্র এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

* * * * একটা কথা চলিয়া আসিতেছে যে অর্দ্ধেন্দু ও আমার শিক্ষাপ্রণালী পৃথক্। * * * আমার শিক্ষার সুর অস্বাভাবিক। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সুরবর্জ্জিত স্বাভাবিক। * * * স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাব প্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন,—সমস্ত কথাই ছন্দে, সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয় এবং ছন্দ ও সুর কলাবিদ্যাবলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয়, আর নট ভাবপ্রকাশক সুরেই অভিনয় করেন। সাধারণের ধারণা গদ্যে যাহা রচিত হয় তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে—গদ্য স্বাভাবিক নহে। ছন্দোবন্ধে আমরা কথা কহি, সুতরাং

ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাব প্রকাশ করি অতএব সুরই স্বাভাবিক। তবে সুর বেশীমাত্রায় করিলে তাহা ঢং হয়, আর অর্দ্ধেন্দুর অশিক্ষিত অনুকরণকে ভাঁড়াম বলে। নাটকশিক্ষার প্রণালী দুই প্রকার হয় না। কোন এক নাটক দুইজন নট দুইভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, দুইভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ দুই নট সেই নাটক একভাবে গ্রহণ করেন তবে ব্যাখ্যা একরূপই হইবে, তাহাতে দুই প্রণালী হইতে পারে না। ব্যাখ্যার ভুল হইতে পারে, কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ যিনি যেরূপে নাটকের ভাব কল্পনা করিয়াছেন তদনুসারে। কিন্তু ব্যাখ্যার বৈচিত্রকে শিক্ষার প্রণালী বলে না। আমরা যে ছন্দে কথা কহি ও সুরে ভাব প্রকাশ করি উহা ভাবিয়া বুঝিতে হয়। যদি কেহ তাহা না বুঝিতে পারেন, তবে তাহার নিমিত্ত আমাকে কি দায়ী হইতে হইবে? কলাবিদ্যা ভাবুকের, সকলের নহে। * * * * * নট মুখে রং মাখেন, কিন্তু দৃশ্যপটের ন্যায় নিকটে তাহা কদর্য্য দেখায়। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনীত হয়, তখন সুযোগ্য বেশকারী পিম্‌সাহেব আসিয়া রং মাখান, নিকটে তাহা অতি কদর্য্য বোধ হইত; কিন্তু দূর হইতে অন্যরূপ দেখাইত—কৃষ্ণবর্ণ নটকেও গৌরবর্ণ মনে হইত—অস্বাভাবিক বোধ হইত না। বর্ণসমাবেশের ন্যায় অভিনয়-সম্বন্ধেও দূরে উক্তি ও নিকটে উক্তিতে প্রভেদ আছে। কথা দূরে শুনাইবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন আছে। সে কৌশল মহালা দিবার সময়ে কঠোর হয়। যিনি এই কৌশল জানেন না তিনি

শিখাইবার সময় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার জন্য যাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন তাহাতে অভিনয় হয় না। যেমন সরুকাজ রঙ্গালয়ের দৃশ্যে চলে না, সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মন্ত্রণা দৃশ্যে, মন্ত্রণা পরামর্শাদি স্বভাবতঃ চুপি চুপি করা হইলেও নটের পরামর্শ চুপি চুপি করিলে চলিবে না। যাহাতে দূরস্থ দর্শক শুনিতে পায় এরূপ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিতে হইবে—Rehearsalএ তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবেই। প্রেমিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সখীকে মনোবেদনা জানাইতেছে—অভিনেত্রী তাহা দর্শককে শুনাইবে, দীর্ঘশ্বাস যে পড়িয়াছে তাহা অন্ততঃ নিকটস্থ দর্শক শুনিবে, আর দীর্ঘশ্বাসজনিত মাংসপেশীসঞ্চালন ত প্রত্যেক দর্শক দেখিবেই। নটনটীর এইরূপ অভ্যাসের সময় নিকটে থাকিলে তাহাদের কার্য্য অস্বাভাবিক বোধ হইবে, কিন্তু দর্শকশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া দেখিলে ওরূপ বোধ হয় না। যিনি অভিনয় শিক্ষা দিবেন শিক্ষার্থীকে তাঁহার উহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষার সময় অনেক কৌশলই নিকট হইতে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু ঐ সকল কৌশলই রঙ্গালয়ের উপযোগী। বৈঠকখানার অভিনয় ও রঙ্গালয়ের অভিনয়ে অনেক পার্থক্য। স্বভাব-সভাব-স্বভাব বলিয়া যে সমালোচক চীৎকার করেন তিনি Shakespearএর স্বগত উক্তিগুলিকে (soliloquies) কিরূপ স্বাভাবিক মনে করেন? কেহ ত কাহাকেও শুনাইয়া মনের কথা বলে না। আবার শুনাইয়া না বলিলেও হ্যামলেটের "To be or not to be—that is the question ইত্যাদির ন্যায় উচ্চ অংশ সকল shakespererএর

অভিনয় হইতে বাদ পড়িত। রঙ্গালয়ের অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক যিনি বিচার করিতে চান তাঁহার শিক্ষিত দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, নচেৎ কাগজ কলম লইয়াই অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলা বিড়ম্বনা মাত্র।"

"নটের আর একটী লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত যিনি অভিনয় করিতেছেন, তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া উচিত। রাণাপ্রতাপ নাটকে পৃথ্বিরাজের ভূমিকা হাস্যরাত্মক ও যোশীবাইএর অংশ গুরুগম্ভীর। একবার এই নাটকের অভিনয়ে পৃথ্বিরাজের ভূমিকার নট হাস্যরস প্রবল করিবার চেষ্টা করায় যোশীবাইএর অভিনয়ে বিশেষ বাধা ঘটিয়াছিল। এই প্রকার বাধা-প্রদানে নট যে কেবল নাটক নষ্ট করেন তাহা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়েরও প্রশংসনীয় পরিচয় নহে। আবার সেই নট যাহাকে দাবাইয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করেন সে যদি তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিনেতা হয় তবে রঙ্গালয়ে তাঁহার এ দোষ অমার্জ্জনীয়। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায় তাহার প্রতি যত্নবান্ হওয়া নটের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।"

"অভিনয়ের প্রতি নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। অর্দ্ধেন্দুর এই অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, রঙ্গালয়ে অভিনয়সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে তিনি তাহার তর্ক বিতর্কে এতই মগ্ন হইতেন যে আহারাদির কথা এক প্রকার ভুলিয়াই যাইতেন। সেস্থলে উপস্থিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কাহারও পলাইবার উপায় থাকিত না। অর্দ্ধেন্দু তাহাদের সকলকে আটকাইয়া রাখিয়া অভিনয়বিষয়ক

তর্ক বিতর্ক শুনাইতেন। অভিনয়সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুর এই আদর্শ অনুরাগ আলোচনা করিয়া অনুরাগ শিখিতে হয়,—তাঁহার অভ্যাস দেখিয়া নটের কার্য্য অভ্যাস করিতে হয়। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের প্রয়োজন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুর বিদ্যাদিগ্‌গজ দেখিয়াছেন তাঁহার স্মরণ হইবে যে আহারান্তে জলপান কালে বিদ্যাদিগ্‌গজের গলার নলী এরূপভাবে সঞ্চালিত হইতেছে যেন গজপতি সত্যই জল পান করিতেছেন। অভিনেতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখুন এ সমান্য কার্য্যও কিরূপ অভ্যাসসাপেক্ষ। বস্তুত অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাট্যজীবন নটের আদর্শ।"

উপরি লিখিত গিরিশচন্দ্রের উক্তি হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষা-প্রণালী একই প্রকারের। গিরিশচন্দ্র এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, যাহারা অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা প্রণালী বুঝেন না, তাঁহারাই কেবল এ কথা বলিতে পারেন, যে অর্দ্ধেন্দুর ও আমার শিক্ষা প্রণালী ভিন্ন প্রকারের।'

কেহ কেহ আবার বলেন,—অর্দ্ধেন্দুশেখর নাকি বলিতেন যে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে বাঙ্গালায় কবিতা পাঠ ত সুন্দর হয়ই,—গদ্য পাঠের সময় ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িলেও সুন্দর হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্র বলেন এ কথা একেবারেই ঠিক নহে। অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় অভিনেতার মুখ দিয়া এ কথা কিছুতেই বাহির হইতে পারে না। তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

অর্দ্ধেন্দুশেখর

"অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচকের মুখে আর একটী নূতন কথা শুনিলাম—তাহা এত বৎসর অর্দ্ধেন্দুর সহিত একত্র বেড়াইয়াও জানিতে পারি নাই। তিনি কাহাকে নাকি বুঝাইয়াছিলেন, যে অভিনয়কালে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে বাঙ্গালায় কবিতা পাঠ তো সুন্দর হয়ই,—গদ্য পাঠও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে সুন্দর হইয়া থাকে। কখনও গুরুগম্ভীর ভূমিকায় 'দীন' অর্থে দরিদ্র, দিবা নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কথা কহিতে প্রায় দেখা যায় না। বরঞ্চ কোন আঘাত লাগিলে বৈপরিত্যই দেখা যায়। 'দীনহীন' শব্দটী তখন দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় না—'দিন হিন' ঐরূপ হ্রস্বই উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিনয় স্বভাবের ছবি—এইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণে অভিনয় বিসদৃশ হইবে। বলেন্দ্রসিংহ ভীমসিংহের ভাই হইলেও তাঁহার মুখে "এইবারে দূত মহাশয়" এরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখা চলিবে না, রাণীর কথাতেও চলিবে না, কৃষ্ণকুমারীর কথাতেও চলিবে না। "কৃষ্ণ-কুমারী" নাটক সাধুভাষায় লিখিত, তাহাতেও ওরূপ উচ্চারণ চলে না,—চলিত ভাষায় যাহা লিখিত তাহাতে ত চলিবেই না—আর কবিতায়—

> নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলীরে
>
> রাধিকারমণ।

এই সুললিত ছন্দ নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী ইত্যাদিরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কেমন সুন্দর হইবে তাহা পাঠক একবার পড়িয়া

দেখুন। * * * * * * * বাঙ্গালা নাটকে অবশ্য কচিৎ কোন ভূমিকায় স্থলবিশেষে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা—ভীমসিংহের ক্ষিপ্তাবস্থায় আকাশের দিকে চাহিয়া "রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডারূপে গর্জ্জন কচ্চেন!" ইত্যাদি স্থলের অভিনয় কালে। কিন্তু তাই বলিয়া যত্রতত্র বর্ণে বর্ণে হ্রস্ব দীর্ঘ লক্ষ্য করিলে চলে না।"

অর্দ্ধেন্দুর সহিত গিরিশচন্দ্রের যে প্রকৃত কোনও মনোমালিন্য ছিল না, এ কথা বোধ হয় আর অধিক লেখার প্রয়োজন নাই। গিরিশচন্দ্রের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি প্রায়ই বলিতেন, "থিয়েটারে আমি ও অর্দ্ধেন্দু হইলাম সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন,—কাজেই আমাদের দুইজনের ভাব সকলের অপেক্ষা বেশী।" মনে মনে অর্দ্ধেন্দুর উপর গিরিশচন্দ্রের যে টান ছিল,—সেরূপ টান তাঁহার অপরের উপর ছিল না। তিনি চিরদিনই অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং যেখানে সেখানে তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, যে সব সময় অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্র এক থিয়েটারে ছিলেন সেই সব সময় অর্দ্ধেন্দুর কথার উপর তিনি কোন দিন কোন কথা কহেন নাই। হয়তো নূতন পুস্তকের ভূমিকা বিতরণের পর একজন অভিনেতার ভূমিকা অর্দ্ধেন্দু পরিবর্ত্তন করিয়া আবার একজন অভিনেতাকে প্রদান করিলেন। এই পরিবর্ত্তনের জন্য থিয়েটারশুদ্ধ সমস্ত অভিনেতা ক্ষুণ্ণ হইয়া অর্দ্ধেন্দুর এই অন্যায়ের জন্য

গিরিশচন্দ্রকে জানাইলেন,—সকলে মিলিয়া গিরিশচন্দ্রকে গিয়া বলিলেন, "অর্দ্ধেন্দুবাবু অমুক অভিনেতার ভূমিকাটী অন্যায় ভাবে কাড়িয়া লইয়াছেন,—এ অন্যায়ের আপনাকে যাহা হয় একটা প্রতীকার করিতেই হইবে।" কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাহার উত্তরে প্রায়ই বলিতেন, "অর্দ্ধেন্দু যখন করেছে, তখন তার প্রতীকার আমি কিছু কর্ত্তে পারি না।"

গিরিশচন্দ্রের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গিরিশচন্দ্রের অর্দ্ধেন্দুর উপর কতটা বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। বঙ্গরঙ্গালয়ে এমন কোন অভিনেতা অভিনেত্রী নাই—যিনি অর্দ্ধেন্দুকে না প্রশংসা করিয়াছেন,—যিনি তাঁহার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়াছেন। যখন সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে মুগ্ধ, তখন কি গিরিশচন্দ্র, যিনি রঙ্গালয়ের জন্য জীবন দিয়া গেলেন,—যাঁহার নাট্যকলা ধ্যান জ্ঞান ছিল তিনি কি প্রতিভার নিন্দা করিতে পারেন? কাজেই বুঝিতে হইবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত কোনও মনোমালিন্য তো ছিলই না, বরং সদ্ভাবই ছিল। আমরা অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্রের সহিত কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা দেখাইলাম। এইবার অর্দ্ধেন্দু কোন কোন ভূমিকা অভিনয়ে অমর হইয়া আছেন তাহাই বলিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়।

অর্দ্ধেন্দুশেখর ৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের অধিকাংশ নাটকেই কোন না কোন ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে 'সধবার একাদশী'তে জীবনচন্দ্র, 'লীলাবতী'তে হরবিলাস, 'নীলদর্পণে' উড্ সাহেব ও 'নবীন তপস্বিনী'তে জলধরের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কয়টী ভূমিকার অভিনয়কালে তিনি এমন একটী নূতন কল্পনা দেখাইয়াছিলেন,—যাহা দেখিয়া স্বয়ং গ্রন্থকারকে পর্য্যন্ত বলিতে হইয়াছিল, যাহা দেখিলাম,—আমার নাটকের ভূমিকা যে এত সুন্দর অভিনয়ে ফুটিতে পারে, তাহা আমি কোন দিন ধারণাও করিতে পারি নাই। এই কয়টী ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু এমন একটী রং দিয়াছিলেন যাহা গ্রন্থকারের কল্পনাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। উপরিলিখিত চারটী ভূমিকারই অর্দ্ধেন্দু যাহা অভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহা একেবারে অননুকরণীয়। এই চারিটির ভিতর আবার জলধরের ভূমিকাটী শ্রেষ্ঠ। অর্দ্ধেন্দুর অভিনীত সব ভূমিকাই অননুকরণীয়, তবে জলধরের তুলনা হয় না। এটী যেন একেবারে সত্যিই জলধরের সজীব মূর্ত্তি জীবন পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। সেই পুকুর ঘাটে শিস্ দেওয়া হইতে 'হোদোল কুতকুতে' পর্য্যন্ত কোথায়ও একটুকু অস্বাভাবিক বা এক ঘেয়ে লাগিত না। নবীন তপস্বিনীর জলধরের ভূমিকাই অর্দ্ধেন্দুকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর

যদি অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে এক জলধরের ভূমিকা ব্যতীত অপর কোন ভূমিকার অভিনয় না করিতেন তাহা হইলেও তিনি ঐ এক ভূমিকা অভিনয় করিয়াই নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিতেন। আমাদের এটা বড় কম দুর্ভাগ্য নহে যে ভাল নাটক আজ কাল আর থিয়েটারে অভিনয় হইবার উপায় নাই। কেমন করিয়া হইবে? আমরা আজকালকার চল্‌তি থিয়েটারের কোন এক স্বত্বাধিকারীর মুখে শুনিয়াছি যে আজ কাল থিয়েটারে ভাল নাটক অভিনয় না হইবার প্রধান কারণ ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী নাই। যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দ্বারা ইদানীন্তন থিয়েটার চালিত হয়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অভিনয় কি জানেনও না বুঝেনও না,—কাজেই তাহাদের দ্বারা প্রকৃত নাটকের অভিনয় করানটা একেবারেই সম্ভবপর নহে। গীতিনাট্য যা তা অভিনেতা দিয়া সাজ পোষাকের জাঁক জমক করিয়া চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নাটকে তাহা হয় না। নাটক জমা না জমা অভিনেতা অভিনেত্রীর উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পূর্ব্বে যে সকল নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গালয়ে তিলার্দ্ধ স্থান থাকিত না,—আজ কাল সেই সকল নাটকের অভিনয় হইলে দর্শকের একেবারে সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না,—তাহার প্রধান কারণ তখন অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল, নাটক আপনি জমিয়া উঠিত,—এখন অভিনেতা অভিনেত্রী নাই, কাজেই নাটক জমে না। এখন যদি কোন থিয়েটারে নবীন তপস্বিনীর অভিনয় হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সে থিয়েটারে দর্শকের

সংখ্যা একেবারেই হইবে না। সে জন্য তো আমরা বলিতে পারিব না যে নবীন তপস্বিনী নাটকখানি কিছু নহে, কিংবা লোকে আজ কাল ওরকম নাটক চায় না। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে আজ কালকার অভিনেতা অভিনেত্রীর দ্বারা আসল অভিনয় হয় না, কাজেই নাটক কেহ দেখিতে চায় না। শুধু নাচ গান দেখিতেই লোকে থিয়েটারে যায়। "জলধরের" ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে এমন একটা অভিনেতা আর বঙ্গরঙ্গালয়ে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আজ কাল যদি কোন অভিনেতা "জলধরের" ভূমিকা অভিনয় করেন, তাহা হইলে সেটা আর অভিনয় হইবে না, অভিনয়ের ভ্যাঙ্গ চানি হইয়া দাঁড়াইবে। বঙ্কিমবাবুর দুই খানি পুস্তকে অর্দ্ধেন্দুশেখর দুইটী ভূমিকার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—একটী "কপালকুণ্ডলায়" মুখুজ্যে মহাশয়, আর দ্বিতীয়টী দুর্গেশ নন্দিনীতে "বিদ্যাদিগ্‌গজ"। কপাল কুণ্ডলার মুখুয্যে মহাশয়ের ভূমিকাটি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই ক্ষুদ্রটুকুর ভিতরই অর্দ্ধেন্দু যে টুকু বস্তু দিয়াছেন তাঁহার সেই টুকুর অনুকরণ আজ পর্য্যন্ত কোন অভিনেতাই পারিল না। যিনিই এই ভূমিকাটি অভিনয় করিয়াছেন, তিনিই একেবারে উহা নষ্ট করিয়া বসিয়াছেন,—যেন চৈত্র মাসের সঙ্, সে যে বিশ্রী অভিনয় হইয়াছে—তাহা কালি কলমে লেখা যায় না। সেই অভিনেতাকে যদি আবার জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি এ ভূমিকাটী কেন এ ভাবে অভিনয় করিলেন,—তাহার উত্তরে তিনি বলেন, "ওটুকু ভূমিকা, ওর আবার হবে কি? যদি তার উত্তরে বলা যায়, কেন মশাই অর্দ্ধেন্দু বাবু তো এইটুকু ভূমিকাও বেশ সুন্দর অভিনয় করিতেন,—

বেশ একটু দেখবার আগ্রহ হতো, আপনাদের তেমন হয় না কেন? তাহার উত্তরে অমনি তিনি বলিয়া ফেলেন,—"আমরা তো আর মশাই অর্দ্ধেন্দু নয়।"

আজকালকার অভিনেতাগণ যে অর্দ্ধেন্দুবাবু নন,—তাহা আমরা জানি। আমি তাঁহাদের অর্দ্ধেন্দুবাবু হইতে বলিতেছি না,—কিন্তু অর্দ্ধেন্দুবাবুর মত চেষ্টা করিতেও কি তাঁহাদের ইচ্ছা হয় না? কেবল বেতন পাইবার আশায় যাহারা অভিনয় করেন,—তাঁহাদের দ্বারা নাট্য-কলার উন্নতি আশা করা একেবারেই যায় না। সাধনা ব্যতীত অভিনেতা হওয়া যায় না, যাহাদের প্রাণের একাগ্রতা নাই তাঁহারা কেমন করিয়া অভিনেতা হইবেন? যাক্ আমরা আসল কথা ছাড়িয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি পুস্তকে অর্দ্ধেন্দুশেখর দুইটী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন,—একটীর কথা বলিয়াছি এইবার দ্বিতীয়টীর কথা বলিব। দুর্গেশনন্দিনীতে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিদ্যাদিগ্‌গজ সাজিতেন। এই বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখরের দেখিয়াছি ও ইদানীং অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরলোক গমনের পর আরও কয়েক-জন অভিনেতার দেখিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই জানিতেন তাহা কত সুন্দর হইত। আহার করিতে করিতে বিমলার ডাকে হুঁ শব্দটুকু পর্য্যন্ত আজও আমাদের কাণে বাজিতেছে। বিদ্যাদিগ্‌গজ আহারে বসিয়াছেন, আহার করিতে করিতে কথা বলিলে আহার নষ্ট হয়, অথচ সাড়া না দিলেও বিমলা ফিরিয়া যায়, এ অবস্থায় সাড়া দিবার

সেই দু'টী কত সুন্দরভাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর আবৃত্তি করিতেন যে সেরূপভাবে আবৃত্তি করা বড় একটা যে সে ক্ষমতার কাজ নয়। এই বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ অভিনয় আর হইবার বড় একটা সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মুখে সেই মাণিকপীরের গানটী,—"মাণিকপীর ভবপারে যাবার না" গানটী এত সুন্দর হইত যে এক মুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকার অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর যথেষ্ট যশ পাইয়াছেন; যখনই অর্দ্ধেন্দুশেখরের কথা মনে পড়ে তখনই সেই তাঁহার বিদ্যাদিগ্‌গজের ছবিটুকু মনের ভিতর অমনি জাগিয়া উঠে। তাহার পর কতবার কত জনের বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা দেখিলাম, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রাণের ভিতর যে ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়, আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই, তাই যখনই অন্য কোন নিম্নশ্রেণীর অভিনেতার দ্বারা এই ভূমিকার অভিনয় আমরা দেখি, তখন যাহারা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দেখেন নাই, তাঁহারা তাহাদের সেই অভিনয় কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের চক্ষে তাহা মহা বিকট ঠেকে।

কবিবর ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকের যখন ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় হয়, তখন এই প্রতাপাদিত্য নাটক তাঁহারই শিক্ষায় গঠিত হয়। প্রতাপাদিত্য নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই চরিত্রটী গ্রন্থকার একভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূমিকাটী অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর তাহা

অপর ভাবে ফুটাইয়া তোলেন। এই ভাব পরিবর্ত্তনে গ্রন্থকার মহালার সময়ে বিশেষ যে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই তাহা নহে, কিন্তু অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা লইয়া যখন অবতীর্ণ হইলেন এবং অভিনয়ে অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া যখন সমস্ত দর্শকগণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিলেন, তখন গ্রন্থকার বুঝিয়াছিলেন অর্দ্ধেন্দুর এই ভাব পরিবর্ত্তনে তাঁহার নাটকের শোভা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতাপাদিত্য নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা ছাড়াও আর একটী ভূমিকা ছিল। তিনি এই নাটকে রডার ভূমিকাও অভিনয় করিতেন। সাহেবের ভূমিকা অভিনয় করিতে অর্দ্ধেন্দুর জুড়ী ছিল না, সাহেবের ভূমিকা নিখুঁত অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার নামই সাহেব হইয়া গিয়াছিল, কাজেই এ ভূমিকাটী কত সুন্দর হইয়াছিল তাহা লেখাই বাহুল্য। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে সে ছবি আজও আমাদের প্রাণে অঙ্কিত হইয়া আছে।

ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর আবার মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। সেই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে সহসা রাণা প্রতাপ নাটকের অভিনয় হইবার কথা হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন কেবলমাত্র অল্পদিন মিনার্ভা থিয়েটারে আসিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারে যে শনিবার রাণা প্রতাপ অভিনয় হয়, সেই শনিবার রাত্রিতে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ রাণা প্রতাপ নাটক তাঁহাদের থিয়েটারে অভিনয় করিবেন স্থির করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পর সপ্তাহেই রাণা প্রতাপ

নাটক তাঁহাদের থিয়েটারে অভিনয় করিতে সক্ষম হন। সে সময় যদি মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর না থাকিতেন তাহা হইলে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কিছুতেই এক সপ্তাহের ভিতর অত বড় একখানি নাটক অভিনয় করিতে সমর্থ হইতেন না। এটা বড় একটা কম বাহাদুরীর কর্ম্ম নহে। রাণাপ্রতাপ নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর পৃথ্বিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই ভূমিকার অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিশেষ নাম লইতে পারেন নাই। পৃথ্বিরাজের ভূমিকা গ্রন্থকার যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে হাস্যরসের অংশ খুব বেশী নাই। কেহ কেহ বলেন এই ভূমিকার অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখর হাস্যরসের বাহুল্যের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। এ কথাটা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, এই ভূমিকাটী অর্দ্ধেন্দুর মত হয় নাই। অভিনয়ে হাস্যরসের এতই বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছিল যে পৃথ্বিরাজের চরিত্রটী একেবারে লঘু হইয়া পড়িয়াছিল, অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় অভিনেতার নিকট হইতে গ্রন্থকার এরূপ আশা করেন নাই। আমরা শুনিয়াছি, দেখি নাই, একদিন নাকি অর্দ্ধেন্দুশেখর পৃথ্বিরাজের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে এমনি তাহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন যে তাহাতে যোশীর ভূমিকা যে অভিনেত্রী অভিনয় করিতেছিল তাহার অভিনয়-পর্য্যন্ত মাটী হইয়া গিয়াছিল। যদি সত্যই এরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেটা অর্দ্ধেন্দুশেখরের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

গিরিশচন্দ্রের নাটক ও গীতিনাট্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর বহু ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতি ভূমিকায় অভিনয়েই তিনি বেশ

একটা নূতন ছবি দেখাইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র যখন আবুহোসেন গীতিনাট্যের মহালা দিতে আরম্ভ করেন তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ইচ্ছা করিয়াই আবুর ভূমিকা গ্রহণ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন ভূমিকাটী স্বয়ং চাহিয়া লইতেছেন তখন তাঁহাকে না বলা যায় না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র, যখন অর্দ্ধেন্দু একরকম জোর করিয়া এই ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তখন মনে মনে এই ভূমিকাটীর জন্য বেশ একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল অর্দ্ধেন্দুশেখরের দ্বারা এই ভূমিকাটী কিছুতেই উত্তম অভিনয় হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম রাত্রে যখন অর্দ্ধেন্দুশেখর এই আবুর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন এবং কৌতুক-অভিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দর্শকগণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিলেন তখন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছিল, "অর্দ্ধেন্দু তোমার জুড়ী নাই। তোমার তুলনা কেবল তুমিই।"

অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে যেমন একটা নূতন ভাব ছিল তাঁহার শিক্ষারও তেমনি একটা নূতন পদ্ধতি ছিল। কেহ কেহ বলেন, "গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা ও অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা প্রণালী ভিন্ন প্রকারের ছিল; সেই জন্য গিরিশচন্দ্রের শিষ্য শিষ্যারা এক ভাবে অভিনয় করেন, আর অর্দ্ধেন্দুর শিষ্য শিষ্যার অভিনয় প্রণালী অন্য প্রথায়।"

"গিরিশ বাবুর দ্বারা ঐ সময়ে যে নবীন শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি ষ্টারের বর্ত্তমান প্রবীণ অভিনতৃগণের উদ্ভব হইয়াছিল। ঐ

প্রণালীর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াই মিনার্ভা থিয়েটার হইতে, শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনুকূল বটব্যাল প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গের উদ্ভব হইয়াছে। * * * *

এই নবীন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি নবীন যুবক অভিনেতা হইয়া উঠে,—যথা,—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী বি, এ, শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি। উপরি লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই গিরিশচন্দ্রের অভিনয়প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অর্দ্ধেন্দু-শেখরের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অভিনেতৃনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন,—যথা, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী হেনা, শ্রীমতী সরোজিনী, শ্রীমতী প্রকাশমণি, শ্রীমতী কিরণবালা, শ্রীমতী ভূষণকুমারী প্রভৃতি।"

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া যে সকল অভিনেতৃ-গণ অভিনেতা নাম পাইয়াছেন ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতৃগণ যাঁহারা অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এই দুই সম্প্রদায়ের অভিনয়ভঙ্গী স্বতন্ত্র। এই দুই তথাকথিত প্রণালীর মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য ব্যতীত প্রকৃত পক্ষে যে বিশেষ কোনও বৈলক্ষণ্য নাই তাহা আমরা পূর্ব্বেই গিরিশচন্দ্রের নিজ বাক্য

উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে এই তথাকথিত দুই প্রণালীর শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর ক্ষণজন্মা পুরুষ,—তাঁহার শিক্ষা অদ্ভুত, তাঁহার সাধনা অদ্ভুত। অভিনয় করিয়া, অভিনয় শিখাইয়া আমোদ-আহ্লাদে হাসিয়া নাচিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গরঙ্গালয় তাঁহার নিকট চির ঋণী হইয়া থাকিবে। তাঁহার শিক্ষায় অনেকগুলি অভিনেতা অভিনেত্রীর সৃষ্টি,—তাঁহার শিক্ষা পাইয়া তাহারা অভিনেতা অভিনেত্রী নামে পরিচিত হইয়া আজও বঙ্গরঙ্গালয়ের গৌরব বহন করিতেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবন রঙ্গালয়ের ভিতর কাটিয়া গিয়াছে,—তাঁহার জীবনের সহিত রঙ্গালয়ের কত স্মৃতিই জড়িত! সে সকল কথা বিস্তৃতভাবে লেখা সম্ভব নহে। আমরা শেষ কয়েকটী কথা লিখিয়া তাঁহার জীবনী শেষ করিব। মানুষকে আনন্দ দিবার জন্যই তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল,—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালীকে নানাভাবে আনন্দ দিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শেষ কথা।

অর্দ্ধেন্দুর গুণের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সহিত একদিনের জন্যও যাহার আলাপ হইয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইয়াছে অর্দ্ধেন্দুশেখরের মত লোক আর হয় না। তাঁহার বাড়ীতে যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তাহাদের তিনি এমন ভাবে আপ্যায়িত করিতেন যে তাঁহারা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা যতক্ষণ তাঁহার বাটীতে থাকিতেন ততক্ষণ অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে নানারূপ মজার কথা বলিয়া এমন আমোদে রাখিতেন যে তাঁহারা তাঁহার বাটী হইতে উঠিতে পারিতেন না। কেহ হয়ত তো সামান্য একটা কথা বলিবার জন্য সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট গিয়াছেন, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর নিকট উপস্থিত হইয়া কথায় কথায় তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে তথাপি উঠিতে পারেন নাই, হয়তো অনেক জরুরী কাজও পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তবুও অর্দ্ধেন্দুর নিকট হইতে উঠিতে পারেন নাই। অর্দ্ধেন্দুর নিকট যাইয়া লোকে কিরূপে সময় অতিবাহিত করিত সে সম্বন্ধে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন আমাদের নাট্যপ্রতিভা সিরিজের জন্য স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাঁহারই ভাব নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

অর্দ্ধেন্দুশেখর

'ব্যোমকেশের সঙ্গে আমি প্রায়ই তাঁদের বাগবাজারের বাসায় যেতেম, তখন বৃদ্ধ অর্দ্ধেন্দুশেখর এসে আমাদের কাছে বস্‌তেন, বুড়ীর পিঠে গড়াবার কথা তিনি যে কতবার আমাদের নকল করে শুনিয়েছেন, তার সংখ্যা নেই। বুড়ি জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে কাঁথা ও লেপ মুড়ি দিয়ে যে পিঠে কি করে তৈরী কচ্ছিল তা অর্দ্ধেন্দু বাবু এমনই কণ্ঠস্বর করে বলে যেতেন যে আমরা হাস্‌তে হাস্‌তে মেঝয় গড়াগড়ি দিয়ে পড়্‌তুম্। আমরা তাঁর ছেলের বন্ধু, কিন্তু তিনি এমনই ভাবে মিশ্‌তেন যেন মনে হ'তো তাঁর সঙ্গে আমাদের বয়স বা পদের কোন পার্থক্য নাই। এক অবাধ সারল্য যেন সকল বাধার গণ্ডী অতিক্রম করে বুড়োকে এনে যুবকের সঙ্গে এক পংক্তিতে মিলিয়ে দিত। গগন বাবুর বাটীতে ষ্টার থিয়েটারের একবার অভিনয় হচ্ছিল—মনে হচ্ছে তা তাঁর বড় ছেলের বিয়ের সময়—সে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে। অর্দ্ধেন্দুবাবু "গজপতি দিগ্‌গজ" সেজে এসেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত পোড়া কাঠের মত পা, লম্বকর্ণ দিগ্‌গজ ঠাকুর সেদিন যেমন আমার চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন—এমন তাঁর বই পড়ে কখন হয় নি। দিগ্‌গজ যখন মুসলমান ফকির সেজে মাণিকপীড়ের ছড়া আওড়াচ্ছিলেন, "হপ্ত দিনের মরা গরু দন্তে কাটে ঘাস"—তাঁর মুখে সেই দিন শুনেছিলুম, এখনও তা বেশ মনে আছে এবং লাঠী হাতে টুপি মাথায় উদ্ভট ফকির মূর্ত্তি এখনও যেন সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন—স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাঁর অভিনয় মনের উপর এমনই ছাপ মেরে গেছে!"

অর্দ্ধেন্দুশেখরের আর এক গুণ ছিল, তিনি কোন নাটকের

সম্পূর্ণ চরিত্রগুলি আয়ত্ত না করিয়া কোন চরিত্র কোন অভি-নেতাকে শিক্ষা দিতেন না। তিনি যখন যে থিয়েটারে থাকিতেন, তখন সেই থিয়েটারে নূতন কোন নাটক অভিনয় হইবার কথা হইলে অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রথমে সেই নাটকখানি আগা গোড়া পাঠ করিতেন। তিনি এমন ভাবে সেই নাটকখানি পাঠ করিতেন যে উহার সমস্ত চরিত্রগুলি তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। নাটকখানি পাঠ করিবার পর তিনি তাঁহার সমস্ত চরিত্রগুলি মনে মনে বিশ্লেষণ করিতেন ও কোন চরিত্রটীতে কোন ঢং দিলে নাটকের সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিবে তখন কেবল হইত তাঁহার তাহাই চিন্তা। এক একটি চরিত্র লইয়া মনে মনে নানাভাবে কেবলই আবৃত্তি করিতেন। এই ভাবে আবৃত্তি করিয়া যে ভাবটা তাঁহার মনঃপূত হইত তিনি সেইভাবেই সেই চরিত্রটী শিক্ষা দিতেন। একবার যদি অর্দ্ধেন্দুশেখর বুঝিতেন যে এই ভূমিকাটীতে এই ঢং দেওয়া উচিত,— এই ঢং দিলে এই ভূমিকাটীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে লোকের কথায় কোন দিনই তিনি তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতেন না। এ সম্বন্ধে আমরা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাঁহারই ভাষায় তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

"ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্য নাটকের তখন ষ্টার থিয়েটারে মহালা চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু তখন ষ্টার থিয়েটারে। এই নাটকখানি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হয় তাহারই জন্য তিনি মহোৎসাহে শিক্ষা দিতে ছিলেন। একদিন রাত্রে ক্ষীরোদ

বাবুর সহিত আমি প্রতাপাদিত্য নাটকখানির মহালা দেখিবার জন্য ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম। প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত সমস্ত নাটকখানির মহালা হইল। রিহার্সল দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম নাটকখানি জমিয়া যাইবে। রিহার্সল শেষ হইতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। রিহার্সল ভাঙ্গিবার পর যখন আমরা বাড়ী ফিরিতে ছিলাম সেই সময় ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, "সমস্ত চরিত্রগুলিই আমার মনোমত হইয়াছে, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের ভূমিকাটা খারাপ হয়ে গেল বলে আমার মনে হয়। ও ভূমিকাটি ঠিক হয়নি।"

ক্ষীরোদবাবুর এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আপনি কেন এ কথাটা অর্দ্ধেন্দুবাবুকে বল্লেন না?"

ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! সাহেব তা'হলে চটে লাল হয়ে যেতেন। ওর ওইটাই হ'লো সব চেয়ে দোষ যে কারুর কথা শোনেন না। যদি ও কথা আমি বলতেম তাহ'লে তিনি চটেমটে ও ভূমিকাটা তো ছেড়ে দিতেনই, হয়তো কোন ভূমিকারই অভিনয় কর্ত্তেন না।"

ক্ষীরোদবাবুর এ কথায় আমি কিন্তু সায় দিতে পাল্লেম না। আমি বলিলাম,—"আপনার যদি সাহস না হয় আমি ও কথাটা কাল তাঁকে বলবো।"

পরদিন সকালে আমি অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং বক্তব্যটুকু তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি যা বল্লে ভায়া ও কথাটা যে আমি ভাবিনি—তা নয়, কিন্তু একটা ভূমিকা নিয়েই একখানা নাটক হয় না; নাটকের সব চরিত্রগুলিরই সামঞ্জস্য রাখা দরকার।

বিক্রমাদিত্যের চরিত্রটা একটু লঘু না কল্লে বসন্তরায়ের ভূমিকাটী কেমন করে ফুটবে ?"

অর্দ্ধেন্দুবাবুর কথাটা আমি বেশ বুঝিলাম,—কাজেই ও সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি করিতে পারিলাম না। যথা সময়ে ষ্টার থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য নাটকের মহাসমারোহে অভিনয় হইল। প্রথম রাত্রেই অভিনয় দেখিবার জন্য আমি ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। স্বয়ং অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা লইয়াছিলেন। আগাগোড়া তাঁহার অভিনয় দেখিলাম, বুঝিলাম তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। আমার মনে হইল বিক্রমাদিত্যের ভূমিকাটী তিনি যে ঢঙে অভিনয় করিলেন তাহাই ঠিক। এ ভূমিকার অন্য যে কোন ঢঙে অভিনয় হইত তাহাতে ভূমিকাটীর গৌরব বৰ্দ্ধিত না হইয়া লঘুই হইত। অর্দ্ধেন্দুবাবুর ঈশ্বর দত্ত এমন একটী ক্ষমতা ছিল যে তিনি ভূমিকাটী একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন, চরিত্রটী কি এবং ইহাতে কিরূপ রং দিলে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। যে রংটী যে ভূমিকায় দিলে সেই ভূমিকাটী ফুটিয়া উঠে তিনি ঠিক সেই রংটী সেই ভূমিকায় প্রদান করিতেন। কাজেই তাঁহার অভিনয় অননুকরণীয় হইত। অর্দ্ধেন্দুশেখর যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেরূপ শক্তি লাভ অতি অল্প অভিনেতার ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।"

অর্দ্ধেন্দুশেখর যদি থিয়েটারের আলোচনা করিতে পাইতেন তাহা হইলে আর কোন আলোচনাই করিতে চাহিতেন না। যখনই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনই তিনি কেবল থিয়েটারের আলোচনা করিতেন। কেমন করিয়া থিয়েটারের

উন্নতি হইবে, কি করিলে অভিনেতা অভিনেত্রীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। লঘু, কৌতুকময় ও গম্ভীর, তিনি সকল রকম ভূমিকারই অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তবে গম্ভীর ভূমিকা অপেক্ষা হাস্যরসপূর্ণ ভূমিকায়ই তাঁহার নাম অধিক, তাহার কারণ আমাদের মনে হয় তিনি হাস্যরসপূর্ণ ভূমিকারই অভিনয় করিতে বেশী ভাল বাসিতেন। সেইজন্য হাস্যরসপূর্ণ ভূমিকারই তিনি অধিক অভিনয় করিয়াছেন। গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়ও তিনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে অতি অল্প। কাজেই হাস্যরসপরিপূর্ণ অভিনয়েই তাঁহার নাম অধিক। যোগেশ ও জলধরের ভূমিকার অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের শেষ অভিনয়। একটী সুগভীর ও অপরটী হাস্যরসপরিপূর্ণ। যোগেশের ভূমিকার অভিনয় আজও হইতেছে, কিন্তু জলধরের ভূমিকার অভিনয় আর হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্দ্ধেন্দুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই ভূমিকার অভিনয়ও শেষ হইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর চলিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী ভাল ভাল বড় ভূমিকার অভিনয়ও একেবারে চিরকালের মত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গরঙ্গালয়ে সে সকল ভূমিকার অভিনয় হইবার আর আশা নাই। সূর্য্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেমন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় সেইরূপ অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের একটা দিক্ একেবারে অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে এদেশে যেমনটী যায় তেমনি আর আসে না।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভায় নিযুক্ত ছিলেন।

তখন মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে। বাঙ্গালার সমুদায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাবেশে তখন মিনার্ভা থিয়েটার সর্ব্বোপরি সগর্ব্বে চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সে সময় শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—থিয়েটারে রাত্রিজাগরণ তাঁহার শরীর আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সেই সময় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তাঁহার থিয়েটার হইতে অবসর লওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। থিয়েটারের সত্বাধিকারিগণ তাঁহার শরীরের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য অবসর লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের সুহৃদ্‌গণ সে অনুরোধটা অন্যভাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে তাড়াইবার মতলব আটিয়াছেন, অতএব তাঁহার অবিলম্বে মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করা উচিত। অর্দ্ধেন্দুশেখর কোন দিনই ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কাজ করিতেন না। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে যেরূপ বুঝাইয়া দিলেন তিনি সেইটাই ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিয়া নব প্রতিষ্ঠিত কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করিলেন। কোহিনুর থিয়েটার তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কাজেই সেখানে সবই নূতন। নূতন থিয়েটার, নূতন অভিনেতা অভিনেত্রী, নূতন নাটক। অর্দ্ধেন্দুশেখর সেই অসুস্থ অবস্থায় নূতন নাটকের মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অসুস্থ শরীরে অত পরিশ্রম আর সহ্য হইল

না, দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়িত হইলেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"যখন শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়, উক্তরূপ সুহৃদ জুটিয়া মিনার্ভা হইতে তাঁহাকে (অর্দ্ধেন্দুশেখরকে) বিচ্ছিন্ন করে। কোহিনুর থিয়েটারে গিয়া পীড়ার যতদূর সাহায্য করিতে হয় করিয়াছে। মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এ সুহৃদ্ নিকটে ছিল। নাট্য জগতের উজ্জ্বল তারকা খসিল। ঐ সকল কর্ম্মচারীর মুখেই এখন আবার তাঁহার নিন্দা—উনি কথা শুনিতেন না, কেবল অত্যাচার করিয়াছেন। আমি তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলি—"বাপু তোমাদের মঙ্গল হউক, রঙ্গালয় যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা তোমরা স্বপ্নেও কখন বুঝিতে পারিবে না। জলধর ও যোগেশ অর্দ্ধেন্দুর শেষ অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে বহুদিন আর "নবীন তপস্বিনী" অভিনয়ের সম্ভব রহিল না।"

অর্দ্ধেন্দুশেখরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকো বাবু) তাঁহার চিকিৎসা যাহাতে রীতিমত হয়, সেইজন্য তাহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যান এবং তাঁহার সাধ্যাতীত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কালের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়াও থাকোবাবু অর্দ্ধেন্দুশেখরকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। দুই চারি দিন চিকিৎসার পর তাঁহার অবস্থা একটু ভাল দাঁড়াইয়াছিল। সে দিন বুধবার। সকালে যিনিই তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তিনিই ভাবিয়াছিলেন অর্দ্ধেন্দু এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। থাকো বাবু চিকিৎসকদিগের সহিত

পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা আর একটু ভাল হইলেই তিনি তাঁহাকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কাশী লইয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইল না। সন্ধ্যার পর হইতেই অর্দ্ধেন্দুর অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ হইল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, যে দিন থিয়েটারে রাত্রি একটার পর অভিনয় হইবে না এই আইন পাশ হইল, সেই রাত্রিতে একটার সময় অর্দ্ধেন্দু সজ্ঞানে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সেই অচেনা দেশে চলিয়া গেলেন যেখানে মানুষ জীবিত অবস্থায় যাইতে পারে না। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুকে শেষ একবার দেখিবার জন্য শত শত লোক থাকোবাবুর বাড়ীতে আসিয়া জমা হইল। যথা সময়ে অর্দ্ধেন্দুর চন্দনভূষিত দেহ নীত হইল। লেলিহান অগ্নি শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অচিরে তাঁহার দেহ ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল,—সব শেষ হইয়া গেল।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের যে কোন দোষ ছিল না এ কথা আমরা কিছুতেই সাহস করিয়া বলিতে পারি না, তবে মোটের উপর দোষে গুণে তাঁহার মত লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধেন্দুশেখর বহুদিন চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আজও বঙ্গরঙ্গালয় তাঁহার অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। অর্দ্ধেন্দুর অভাব কোন দিনই পূর্ণ হইবে না, পূর্ণ হইবারও নহে।

পরিশিষ্ট

"Art necessarily presupposes knowledge. Art, in any but its infant state, presupposes scientific knowledge ; and if every art does not bear the name of a science, it is only because several sciences are often necessary to form the groundwork of a single art."—J. S. Mill.

"Art is the right-hand of nature. The latter only gave us being, but 'twas the former made us men. Practical success in art must come from every day ambition and experiment."—Stedman.

অভিনয় সম্বন্ধে এযাবৎ আমরা নাট্যপ্রতিভা সিরিজে যতটুকু বলিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে অভিনয় যে ঢঙ কিংবা নানা পোষাকে আবৃত হইয়া যথেচ্ছ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনা করিতে করিতে কতগুলি কথার আবৃত্তি নহে তাহা বোধ হয় আমাদের পাঠকমাত্রকে বুঝাইতে পারিয়াছি। 'পুতুলের নাচ', 'বহুরূপীর সাজ', 'যাত্রার সঙ্গীত', 'হাফআকড়াইয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি', 'বেদীয়ার খেলা' চিত্রাভিনয়,—এগুলি যে একেবারে অভিনয় নহে তাহা বলিবার যো নাই, কেন না অবস্থার অনুকরণ মাত্রই অভিনয়, তবে উহারা ললিতকলার প্রধান অঙ্গরূপী অভিনয় নহে। অবস্থার প্রকৃত অনুকরণই অভিনয়, কল্পিত অস্বাভাবিক অনুকরণ অভিনয় নহে। সেইজন্যই মানুষের

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বাক্য, সাত্ত্বিকতা ও বেশের অনুকরণে চারি প্রকারের অভিনয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাষা বা নাট্যাদির আত্মা বা জীবন-স্বরূপ রসের ঠিক অনুরূপ বাক্যের আবৃত্তি, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য, বেশভূষা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা ও সাত্ত্বিকতা হওয়া চাই। যেমন হাস্যরসের অভিনয়ে শোকসূচক বেশভূষা ও বাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করিলে অভিনয় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যে ব্যক্তিকে দেখিলেই হাসি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে তিনি যদি করুণ বা বীররসের অভিনয়ে অগ্রবর্ত্তী হ'ন তাহা হইলে সমুদায় নাটকখানি একেবারে মাটী হইয়া যায়। নট বা অভিনেতার কার্য্য অতি কঠিন। যেমন কবি শুদ্ধ বিদ্যার বলে হয় না, স্বভাবদত্ত প্রতিভা চাই, সেইরূপ অভিনেতাও কেবল শিক্ষায় হয় না, নিসর্গজ প্রতিভা চাই। এই কথাটি সঙ্গীতের অনুশীলনে সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বভাব-দত্ত সুর ও মধুর স্বর না থাকিলে শত শিক্ষায়ও সুগায়ক হওয়া যায় না। সেইরূপ স্বভাবপ্রদত্ত প্রতিভার অভাবে কেবল শিক্ষাপ্রভাবে সাধু অভিনেতা হওয়া যায় না। এই প্রতিভার মূল রসবোধ, সৌন্দর্য্যদর্শনক্ষমতা, স্বেচ্ছানুরূপ স্বরপরিবর্ত্তন এবং অঙ্গাদির প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ক্ষমতা। যেমন সুসার মাটীতে সহজে অঙ্কুর উদ্গত হইলেও জল, বায়ু, আলো প্রভৃতির দ্বারা উহা ক্রমশঃ প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ স্বভাবদত্ত প্রতিভাবলে অভিনেতা হইলেও শিক্ষা, অভিনয়, সাধনা ব্যতীত একজন প্রকৃত অভিনেতা হওয়া যায় না। অভিনয়কলার ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তের অনুশীলনেও জানা যায় যে উহা কত শতাব্দীর সাধনায় তাদৃশ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

বস্তুতঃ নৃত্য, গীত, বাদ্য, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক, অভিনয় কত শত বৎসরের অনুশীলনের ফল! প্রথমতঃ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাগ্রে মানবচিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া যাইতে হয়, তারপর এই সঙ্গীত ও অভিনয়ের কিরূপে অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এবং পরিশেষে ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি অঙ্গের পরিপুষ্টি কত শত যুগের একপ্রাণ সাধনার ফল তাহার নির্ণয় দূরে থাক, ভাবিতেও চিন্তাশক্তি অক্ষম।

আমাদের দেশে একদিন সর্ব্ব কলার চরম বিকাশ হইয়া গিয়াছিল। উহার জন্য আমাদের বিদেশীর নিকটে গর্ব্ব করিবার অবসর আছে বটে, কিন্তু ইহার বেশী আর কিছুই নাই—প্রত্নকালের কলাচর্চ্চার আমাদের কিছুই বর্ত্তমান নাই। আমাদের আবার ঐ সব কলার পুনরায় মূল হইতে চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। সুদূর অতীতের শুদ্ধ গর্ব্ব ব্যতীত প্রদর্শনের আমাদের আর কিছুই নাই। সেই পুষ্পকবিমান, তিরস্করণীবিদ্যা, বাষ্পীয়শকট, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি এখন কেবল কতকগুলি পাণ্ডুলিপিগত দুঃস্বপ্ন মাত্র।

বর্ত্তমান নাট্যাভিনয়ও রঙ্গমঞ্চ ইয়োরোপীয় থিয়েটারের অনুকৃতিতে গঠিত। কিন্তু বর্ত্তমান উদীয়মান ইয়োরোপ ও আমেরিকা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক মতে নাট্যাভিনয়ের অভ্যুন্নতিতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা কত আয়াসে ভারতের, গ্রীসের ও মিষরের সেইসব পুরাতন ছিন্ন, দুর্ব্বোধ পাণ্ডুলিপিগুলি আহরণ করিয়া তাহা হইতে দৈনন্দিন নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া স্বস্ব নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। আমরা

আবার তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির আনুকূল্যে নিজেদের নৈজের দিন দিন উন্নতি সাধন করিতেছি।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে অভিনয় ও অভিনেতার বিভাগ অষ্টবিধ রসের বিভাগ অনুসারে হইত। কিন্তু ইয়োরোপে গ্রীসের পুরাতন বিভাগ অনুসারে উহাদের tragic, comic, tragi-comic এই তিন রকমের শ্রেণীভাগ হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস রসের অভিনেতাই ইয়োরোপীয় নাট্য শাস্ত্রের tragic অভিনেতা, শৃঙ্গার, শান্ত ও হাস্যরসের অভিনেতা comic অভিনেতা এবং ইহাদের দুই শ্রেণীর পরস্পর মিশ্র রসের অভিনেতা tragi-comic অভিনেতা। স্থূলতঃ বিয়োগান্ত চরিত্রের অভিনেতাকে 'ট্রাজিক একটর' বলে, মিলনান্ত চরিত্রের অভিনেতাকে comic actor এবং বিমিশ্র চরিত্রের অভিনেতাকে tragi-comic actor বলে। ইয়োরোপীয় হিসাবে এই তিন শ্রেণীর অভিনেতাদের মধ্যে আবার high, low এবং middle অর্থাৎ গুরু, নিম্ন ও মধ্য শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইয়োরোপীয় মতে high tragic, low tragic, middle tragic, high comic, low comic, middle comic, high tragi-comic, low tragi-comic এবং middle tragi-comic এই নয় শ্রেণীর অভিনেতা আছে। এই বিভাগ অনুসারে অর্দ্ধেন্দুশেখর একজন অসাধারণ high comic অভিনেতা ছিলেন। শৃঙ্গার, হাস্য ও শান্ত রসের অভিনয়ে তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। অতঃপর করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎসের

কৌতুকানুকরণে একরূপ তাহার তুলনাই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাস্তবিক কোন নাটকেই অবিমিশ্র tragic কিম্বা comic কোনও characterই বড় পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম শ্রেণীর প্রায় নাটকেই বিমিশ্র চরিত্রই পরিদৃশ্য হইয়া থাকে। তবে উহাদের মধ্যে যে ভাবের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিপুষ্টি চরিত্রটি সেই নামেই সাধারণতঃ কথিত হইয়া থাকে। নবীনতপস্বিনীতে "জলধর চরিত্র" অবিকল comic নহে। উহাতে tragicএর ও touch আছে। তাহা হইলেও উহা comic চরিত্র বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। সেইরূপ দুর্গেশনন্দিনীর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্র' comicপ্রধান বলিয়া comic বলিয়াই সর্ব্বত্র বিদিত। প্রফুল্লে 'যোগেশ' চরিত্রে কি comic কিছু নাই? তাহা সত্ত্বেও উহা একটি high tragic character. কি ট্রাজিক কি কমিক, উভয় চরিত্রেরই প্রকৃত অভিনয় বড়ই কঠিন। পরের চরিত্র নিজের ভিতর লইয়া ফুটাইয়া তুলিয়া দর্শককে অবিকল তাহা দেখান বড় কঠিন কার্য্য। তাই আমরা কলেজের অধ্যাপকগণ অপেক্ষা রঙ্গালয়ের অধ্যাপকগণের কৃতিত্বের অধিকতর সাধুবাদ করি। কলেজের অধ্যাপকগণ মাত্র তাঁহাদের সুবিদ্বান্ ছাত্রদিগকে দুর্ব্বোধ ভাবগুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই চরিতার্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু রঙ্গালয়ের অধ্যাপকদিগকে নাট্য চরিত্রসমূহ কতকগুলি অশিক্ষিত বা অৰ্দ্ধশিক্ষিত অভিনেতাকে বুঝাইয়া দিয়া উহাদের প্রতিচরিত্রের অবিকল অনুকরণ অভিনয়ে দেখাইতে হয়। রঙ্গালয়ে নাটকখানির জীবন্ত চিত্র আমরা পরিদর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া যাই। গিরিশচন্দ্র,

অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতির তাই এত প্রশংসা, এত সমাদর। প্রকৃত অভিনেতা স্বীয় অভিনয়ে প্রতিরসের জীবন্ত চিত্র প্রতিফলিত করেন বলিয়াই তিনি অনন্যসাধারণ, ক্ষণজন্মা বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি পাঠে পাঠকের চিত্তে যে ভাবের খানিকটামাত্র উন্মেষ হয়, অভিনয় দর্শনে তাহা পূর্ণোদ্বেলিত হইয়া লহরে লহরে সমস্ত চিত্ত-কন্দর ছাপাইয়া ফেলে। অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শক তন্ময় হইয়া যায়। তাই সমগ্র কাব্য সাহিত্যে দৃশ্য-কাব্যের স্থান সর্ব্ব প্রথম। এসকাইলাস, সফক্লিস, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, মোলিয়র, রেসিনি, ইবসেন্, মেটারলিঙ্ক, কল্ডিরন প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যকারগণ বিশ্বপূজ্য, এবং তাঁহাদের দৃশ্যকাব্য গুলির জীবন্ত অভিনেতৃগণ বিশ্বের সাহিত্যিক সমাজে পরম বরেণ্য।

অর্দ্ধেন্দুশেখর একজন ক্ষণজন্মা অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষক। তাঁহার আকৃতি, বাক্য, গতি, চিন্তাস্রোত,—সকলই তাঁহাকে আবাল্য স্বভাবতঃ অভিনয়ের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল; কেননা আজ কাল অভিনয় কার্য্য তত নিন্দার বলিয়া বিবেচিত না হইলেও অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন প্রথমে অভিনয়কার্য্যে যোগদান করেন তখন উহা নিতান্ত নিন্দার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি তাঁহার উচ্চবংশাভিমান, পিতামাতার তিরস্কার, আত্মীয় স্বজনের নিবারণ, সমুদায় উপেক্ষা করিয়া প্রাণের আকর্ষণে স্বীয় জন্মজন্মান্তরের সাধিত অভিনয়ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ইংরাজি সাহিত্যাদিতে শিক্ষিত ছিলেন ও তাঁহার যেরূপ আত্মীয়স্বজন

ছিলেন তাহাতে তিনি বিনায়াসে উচ্চ বেতনের কর্ম্মে নিয়োজিত হইতে পারিতেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাই তিনি অহর্নিশ নাট্যালোচনায়ই নিরত থাকিতে ভালবাসিতেন। নাট্য-গ্রন্থখানি পাইলেই তিনি উহার চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে তন্ময় হইয়া যাইতেন, সময় সময় এমন হইত যে গ্রন্থকার অপেক্ষা শ্রোতা অর্দ্ধেন্দুর তদীয় নাটকীয় চরিত্রে অধিক দখল দেখা যাইত। গ্রন্থকার একেবারে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর যেমন অসামান্য অভিনেতা ছিলেন, তাদৃশ অনন্যসাধারণ অভিনয়শিক্ষকও ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার ও গিরিশচন্দ্রের পর আর আমরা নূতন চরিত্রের অভিনয় আদৌ দেখিতে পাই না। এক দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' ও 'চাণক্য' চরিত্র একেবারে অভিনব, ও অনন্যসাধারণ। তদ্ব্যতীত আর নূতন চরিত্র কোথায়ও নাই। যত সব নূতন অভিনয় হইতেছে, সর্ব্বত্র কেবল পুরাতনের ছাপ ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থকারগণ যে নূতন চরিত্রের অবতারণা করিতেছেন না তাহা ঠিক বলা যায় না, বরং এক্ষণে অনেক সাহসিক নাট্যকারই বিলাতি নামকরা চরিত্রগুলির প্রকাশ্য অনুকরণে নূতন নাটকীয় চরিত্র স্বস্ব গ্রন্থে প্রদান করিতেছেন, কিন্তু উহাদের অভিনয়ে নূতনত্ব কিছুই বিকসিত হইতেছে না, সেই পূর্ব্বভাবই সর্ব্বত্র একটু সংস্কৃত হইয়া প্রদর্শিত হয় মাত্র।

ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল নাটকখানি দেখা, আর অভিনয়ের জন্য 'রিহার্স্যালে' ফেলিয়া দওয়া। কোন চরিত্রের কিরূপ

বিশ্লেষণে নূতনত্ব প্রদর্শিত হইবে, কিসে নাটকখানির অভিনবত্ব বজায় থাকিবে, তাহার প্রতি বড় কাহারও দৃষ্টি থাকে না।

কলেজের একজন অধ্যাপককে একখানি নূতন গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতে হইলে অন্ততঃ দুই কি এক মাস কাল প্রগাঢ় মনোনিবেশের সহিত উহার অধ্যয়ন আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের অধ্যাপক মহাশয়দের একখানি নূতনগ্রন্থ পাইলে এমন কি ভাল করিয়া একবার পড়িয়া দেখিবারও প্রায় অবকাশ হইয়া উঠে না। গ্রন্থকার একদিন হয়তো পড়িয়া গেলেন, অমনি সব হইয়া গেল। গ্রন্থের মধ্যে চরিত্রগুলির পরস্পর সামঞ্জস্য, ভাবাবিবেক, দৃশ্যাদির ক্রমবিকাশ, ঘটনাসমাবেশ, মৌলিকত্ব কিছুরই প্রতি কাহারও নজর থাকে না। তাই আজকাল আর কেহ থিয়েটারে নাটকের অভিনয় দেখিতে যান না, 'অপেরার' নৃত্যগীত ও দৃশ্যাদি দেখিতেই ভূরিপরিমাণে দর্শকসমাবেশ হইয়া থাকে। উহার চরমফলে কলিকাতায় বায়স্কোপ-আগার ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও তাঁহাদের প্রথম জীবনের শিক্ষিত শিষ্যগণ অভিনয় কলার যাদৃশী অভ্যুন্নতি করিয়া গিয়াছেন ক্রমশঃ দৈনন্দিন যদি তদনুরূপ উহার উন্নতি হইতে থাকিত তাহা হইলে এক্ষণে বাঙ্গালার ষ্টেজ ভারতের অন্যত্র সর্ব্বত্র আদর্শ হইয়া যাইত। যাঁহারা জীবনপাত পরিশ্রমে রঙ্গালয়কে ললিতকলাশ্রম করিয়া তুলিতেছিলেন তাঁহাদের অবসানে রঙ্গালয় আবার সেই 'নাচ ঘর' হইয়া যাইতেছে ভাবিতেও নাট্যানুরাগিমাত্রেরই চক্ষে জল আসে, প্রাণে দারুণ হাহাকার জাগিয়া উঠে।

এক্ষণে রঙ্গালয়ে বিপুল অর্থাগম হয়, এবং নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং কলাহিসাবে অভিনয়ের উন্নতি-বিধান এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক। কিন্তু কেবল অলসতাপ্রযুক্ত যে সমাজাভ্যুদয়ের প্রধান উপাদান, সুসাহিত্য-শিক্ষার মুখ্য আশ্রম, রঙ্গালয় ক্রমশঃ দিন দিন 'নাচ ঘরে' পরিণত হইয়া যাইবে, ইহা কি নবীন দেশহিতৈষিগণের সবিশেষ ভাবিবার জিনিষ নহে? ঐক্য, সুশিক্ষা, সুচিন্তা, আত্ম-প্রসার, চিত্ত-বৈশদ্য প্রভৃতিই জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রধানতম কারণরূপে চিরদিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সমুদায় গুণাবলীর সুপ্রসার-ক্ষেত্রই রঙ্গালয়। সুতরাং রঙ্গালয়ের অভ্যুন্নতি দেশহিতৈষিবর্গের উপেক্ষণীয় নহে।

যেমন গাত্রালঙ্কার, সাজসজ্জা, বহির্বিজ্ঞাপনা প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক নহে, সেইরূপ দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও বহির্বিজ্ঞাপনা অভিনয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য্যজ্ঞাপক নহে। যেমন গুণাবলিই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, সেইরূপ রসানুরূপ চতুর্বিধ অভিনয়ই নাটকের প্রকৃতপরিচায়ক। এই অভিনয়ে কেহ কেহ আবার স্বভাব স্বভাব বলিয়া ক্ষেপিয়া যান। তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে, অভিনয় একটি সুকুমার কলা, ঠিক স্বভাব নহে। অবস্থানুকৃতিই অভিনয়, অবস্থাকল্পনা নহে। অনুকরণ হইলেই তাহাতে কৃত্রিমতা কিছু কিছু থাকিবেই। অঙ্গসঞ্চালনার অনুকরণ, বাক্যের অনুকরণ, বেশভূষাদির অনুকরণ, সাত্ত্বিকতার অনুকরণ, সর্ব্বত্রই নকলে কৃত্রিমতার মিশ্রণ থাকিবেই। আবার অনুকরণের কৃত্রিমতা বড়

কঠিন, বড় ক্লেশসাধ্য। বাস্তবিক চাষা না হইয়া একটি চাষার অবিকল অনুকরণ, প্রকৃত শোকার্ত্ত না হইয়া একজন সদ্যঃপুত্র-শোকার্ত্তের অনুকরণ কি কঠোর ক্লেশসাধ্য তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রই অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন জলধরের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন তখন বস্তুতঃই জলধরের জীবন্ত চিত্র দর্শকের নেত্রপথে বিরাজিত হইত। সেই চেহারা, সেই অঙ্গচালনা, সেই কথার স্বর,—সবই জলধরের। দর্শক তৎকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার সেই 'হোঁদলকুত্‌কুতের' আকৃতিতে পঞ্জর মধ্যে অবস্থিতি। বস্তুতঃ তৎকালে প্রকৃত দৃশ্য ব্যতীত রঙ্গালয় বলিয়া কোন দর্শকেরই মনে থাকিত না। আবার তাঁহার বঙ্কিম-চন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে বিদ্যাদিগ্‌গজের অভিনয়। আমাদের মনে হয় অর্দ্ধেন্দু-বিদ্যাদিগ্‌গজ বঙ্কিমকল্পনাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। কিরূপে যে মুস্তোফি মহাশয় দেহ, মন, বাক্য, এমন কি চেহারার উপরেও এতাদৃশ প্রভুত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আমাদের দেশে গুণের প্রকৃত আদর নাই, তাই ঈদৃশ গুণবানের স্মৃতিস্তম্ভ অদ্যাপি, অন্ততঃ বাঙ্গালার রঙ্গালয় গুলিতেও পরম সমাদরে স্থান পাইল না। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যে সব অভিনেতার জীবনী শত শত প্রকাশিত হইতেছে, যাহাদের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি ও স্মৃতিসভা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে, গুণপণায় তাঁহাদের কাহার অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখর ঊন ছিলেন তাহা আমরা জানি না। অথচ অদ্যাবধি তাহার প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে

থা'ক, একখানি জীবনীও লেখার যোগ্য বিবেচিত হইতেছে না। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়—আমাদের কম মূঢ়তার পরিচয় ?

আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর কমিক্ অভিনেতারই মৌলিক আদর্শ বর্ত্তমান আছে। যেমন high comic এবং middle tragi-comic অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর, সেইরূপ middle comic এবং high tragi-comic অভিনয়ে অমৃতলাল, আবার low comic এবং low tragi-comic অভিনয়ে অক্ষয়কুমার (হাস্যার্ণব)। তদ্ব্যতীত সংসারে 'মামা', বলিদানে 'রেমমামা' প্রভৃতি মিশ্র চরিত্রাভিনয়ে মন্মথনাথ (হাবুবাবু)। ইঁহাদের প্রত্যেকের অভিনয়ই মৌলিক, নিখুঁত এবং প্রথম শ্রেণীর। যেমন অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'জলধর', 'বিদ্যাদিগ্‌গজ', 'আবুহোসেন', 'বিক্রমাদিত্য', এমন কি 'বরুণচাঁদ' অননুকরণীয়, সেইরূপ অমৃতলালের 'গদাধরচন্দ্র', 'রমেশ', 'বিদূষক', 'নসীরাম', এমন কি খাসদখলের 'নিতাই', ইহাদের প্রত্যেকেই অনভিগম্য, আবার কাপ্তেন বেলের (৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) 'অঘোর', 'ধীবর' অননুসরণীয়।

অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কেবল comic ভূমিকারই অভিনয় করিতেন তাহা নহে, তিনি 'যোগেশ' প্রভৃতি গুরুগম্ভীর ভূমিকারও অভিনয় করিয়াছেন। তবে তাহার comic অভিনয়ের অপ্রতিম যশোরবি tragic অভিনয়ের গৌরবচন্দ্রমাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বসন্তের পিককাকলী যেমন অপর সমুদায় সুস্বর পক্ষীর কূজনকে ঢাকিয়া দেয় সেইরূপ অর্দ্ধেন্দুর comic অভিনয়ের বিপুল মাধুরীস্রোত তাঁহার tragic অভিনয় যশোলহরী অদৃশ্য করিয়া দিয়াছে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর

অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রগাঢ় অভিনয়ানুরাগ আদর্শ স্থানীয়। রঙ্গালয়ই তাঁহার আবাস স্থান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অহোরাত্র তিনি নাট্যালোচনা, অভিনয়শিক্ষা, নূতন নাটাগ্রন্থের ভূমিকাগুলির কোনটীর কিরূপ অভিনয় হইবে উহার চিন্তা, স্বরপরিবর্ত্তন সাধন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইচ্ছানুরূপ সঞ্চালন কৌশল প্রয়োগ, কোন অঙ্কে কিরূপ দৃশ্য ও পরিচ্ছদ হইবে উহার বিবেক অথবা রঙ্গালয়সংক্রান্ত নানাবিধ কথাবার্ত্তায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার শিক্ষা অচিন্তিতপূর্ব্ব ছিল না, এবং ক্ষুদ্র হইতে প্রধানতম কোনও অভিনেতারই তাহার ভূমিকার সম্যক্ শিক্ষালাভ ব্যতীত মুস্তোফী মহাশয়ের নিকট নিস্তার ছিল না। সেই জন্যই অর্দ্ধেন্দুর আমোলে অভিনয় যেরূপ দোষশূন্য হইত এমন আর কখনও হয় নাই। তিনি প্রকৃতই অভিনয়সাধনা করিতেন এবং তাঁহার অধীনস্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে তাদৃশ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন। বস্তুতঃ তাঁহার নাটাসাধনা ঈদৃশ প্রগাঢ় ছিল যে তিনি যে কোন নাট্যানুরাগী ব্যক্তিকে নিজের সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন, এবং থিয়েটারের অভিনেতৃবৃন্দই তাঁহার সমুদায় স্নেহের অধিকারী ছিল, এমন কি এই নাট্যসাধনার জন্য তিনি স্বগৃহ, স্ত্রী, পুত্র প্রায় সকলেরই সঙ্গ একরূপ ত্যাগ করিয়া রঙ্গালয়নিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১২৫৬ সালের ১০ই মাঘ বুধবার তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৩১৫ সালে দুই পুত্র বিদ্যমানে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। উনষষ্টি বৎসর পূর্ণ না হইতেই এই মহানাট্য-সাধকের ভবলীলা পূর্ণ হয়। গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখর অপেক্ষা প্রায় ছয় বৎসরের বড়

ছিলেন এবং তিনি প্রায় ৬৮ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। রঙ্গালয়ের কর্ম্মে পরিশ্রমাধিক্য ও নিশাজাগরণে লৌহকঠোর স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তিরও পূর্ণকাল জীবিত থাকা সম্ভব হয় না। তাই বাঙ্গালার নাট্যশিল্পিদিগের কেহই পূর্ণকাল জীবিত থাকিতে পারেন নাই, অনেকেই ৫০ বৎসরের পূর্ব্বেই ভবধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা সৃষ্টির প্রথম যুগে যে কয়েকটি নাট্যসাধকরত্ন রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে যদি বিধাতার প্রসাদে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বাণীর সেবা করিতে পারিতেন তাহা হইলে এক্ষণে রঙ্গালয়ে ঈদৃশ রঙ্গশিক্ষকের ও অভিনেতার অভাব হইত না। পুরাতন যুগের মাত্র একটি রত্নস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে ও বার্দ্ধক্যের পীড়নে তাঁহার নিকট হইতেও কেহ কোনও প্রকৃত সাহায্য পাইতেছেন না। আমাদের মনে হয় এখনও তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া নব্যতন্ত্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের উপদেশগ্রহণ নিত্যান্ত কর্ত্তব্য। কেবল গ্রন্থপাঠে practical side of the play সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ সুদুঃসাধ্য। এখনও তাঁহার 'নিমচাঁদের' ভূমিকার অভিনয় যাহা হয় তাহা দেখিয়া বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয় আর দেখিবার ইচ্ছা থাকে না।

আমাদের এই উক্তির ব্যাখ্যা কেহ যেন অন্যরূপ না করেন। বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে অভিনেতা কেহ নাই তাহা আমাদের বক্তব্য নহে। বস্তুতঃ ইদানীন্তন রঙ্গালয়ে উদীয়মান অভিনেতা অনেকেই আছেন,

যাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষকের অধীনে কর্ম্ম করিলে হয়ত পূর্ব্বতনদের অপেক্ষা উচ্চস্তরের অভিনেতা হইতে পারিতে। কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষা ও পূর্ব্বের সেই শিক্ষার atmosphereএর অভাবই আমাদের প্রধানতম বক্তব্য। যে অভিনেতা 'চাণক্য', 'সিরাজুদ্দৌলা' 'শিবজী' প্রভৃতি অতি জটিল, সুকঠিন চরিত্রের অতি উচ্চাঙ্গের মৌলিক অভিনয় করিতে পারেন, যে অভিনেত্রী 'শৈবলিনী', 'আয়েষা', 'রামানুজ', প্রভৃতি সুজটিল নানাভাবময় চরিত্রের মৌলিক প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করিতে পারে, যাহার 'প্রমীলা', মর্জ্জিনা', প্রভৃতি নবভাবময় অভিনয় দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে নিয়ত জাগরূক, যাঁহার 'দাদামহাশয়', 'সুধন' প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় এখনও সহৃদয় দর্শকমাত্রেরই প্রাণে চিরজীবিত, তাঁহাদের মত অভিনেতা ও অভিনেত্রী এখনও যখন বঙ্গরঙ্গালয়ে বিদ্যমান, তখন কে বলিবে যে রঙ্গালয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রী নাই? তবে ঐ সঙ্গে অবশ্য বলিতে হইবে যে এখন আর সে নাট্য-সাধনা বা অভিনয়ের একাগ্রতা নাই, কেননা সেই সাধনা নিয়ত জাগরূককারী প্রকৃত নাট্যসেবী শিক্ষক কেহ নাই। সে গিরিশচন্দ্র, সে অর্দ্ধেন্দুশেখর, সে অমৃত মিত্র, সে অমরেন্দ্র, সে কাপ্তেন বেল, সে কেদার চৌধুরী, সে ধর্ম্মদাস প্রভৃতি সর্ব্বস্বপণ নাট্যসেবিগণ আর ইহ জগতে নাই। সেই সাধনাযুগের যে একজন নাট্যসেবী বসু মহাশয় এখনও জীবিত আছেন, তিনিও কার্য্যতঃ অবসরপ্রাপ্ত। এদেশে কি আবার একদিন প্রকৃত নাট্যকলাসেবীর অভ্যুত্থান হইবে না? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে সর্ব্বত্র দিন দিন বাঙ্গালা অভ্যুন্নতির অত্যুচ্চ শেখরে উঠিতেছে, কলাশ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয়ানুশীলনে কি বাঙ্গালা

পশ্চাৎপদ থাকিবে? গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির আজীবন সাধনা কি তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্ত হইবে? কৃত্রিম বায়স্কোপ-অভিনয় আসিয়া কি দেশ হইতে প্রকৃত কলার অনুশীলনের বিলোপ সাধন করিবে?

এখন আর রঙ্গালয়ের পূর্ব্বের মত অর্থাভাব নাই, দর্শক সংখ্যা দিন দিন আশাতীত বাড়িতেছে; সাজ সরঞ্জাম ও দুষ্প্রাপ্য নহে, বিলাত ও আমেরিকা হইতে সহজেই সব জিনিষ সরবরাহ হইতে পারে; অভিনেতা ও অভিনেত্রীরও অভাব নাই, রঙ্গালয়ে কার্য্য-গ্রহণ এখন আর নিন্দনীয় নহে; অভিনেয় গ্রন্থেরও অভাব নাই, প্রতি মাসেই ভূরি ভূরি নাট্যমালা প্রকাশিত হইতেছে। কেবল অভাব এক—সেই সাধনার, সেই উন্মাদনার, সেই অনুপ্রেরণার। সে সাধক নাই, সে জীবনপণ নাট্যসেবী নাই, তাই দিন দিন নাট্যা-গার শুদ্ধ 'নাচঘরে' পরিণত হইতেছে, আর বায়স্কোপ আসিয়া নাট্য দর্শকের সংখ্যা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের মনে হয় বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকৃত নাট্যসেবীর আহরণ করা প্রতি রঙ্গালয়াধিকারীর কর্ত্তব্য। স্বদেশে তাদৃশ নাট্যকুশল শিক্ষকের অভাব হইলে বিদেশ হইতে আনাইয়া তাঁহার শিক্ষায় আবার কতকগুলি শিক্ষকের সৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যক। পুরাতনের অনুকরণে আর চলিবে না, নূতনের নিতান্ত দরকার, তাহা না হইলে রঙ্গালয়গুলি অচিরে চিত্রদর্শনাগারে পরিণত হইবে, বাঙ্গালার চির নাট্যকৌশল খ্যাতি একেবারে লোপ পাইবে। যেমন ক্রমে সঙ্গীতের খ্যাতি বাঙ্গালা হইতে একরূপ লোপ পাইয়াছে, সেইরূপ অভিনয়খ্যাতিও যাইবে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অন্যান্য গতায় নাট্যরথীদিগের জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথির মহোৎসব, প্রতি রঙ্গালয়ে হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি রঙ্গালয়ে উঁহাদের চিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে বর্ত্তমান অভিনেতৃবৃন্দ নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। প্রতি নাট্যসেবীর সম্মুখে এই সব নাট্যসাধকদিগের জীবনী উন্মুক্ত করিয়া কিরূপে তাঁহারা সুকঠোর নাট্যসাধনায় সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন তাহা অবগত করান নিতান্ত দরকার, তাহা না হইলে কেবল জীবিকার জন্য অভিনেতা হইয়া অভিনেতৃগণ না করিবেন রঙ্গালয়ের উন্নতি, না করিবেন নিজ জীবনের উন্নতি, শুধুই 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে' অবস্থান করিবেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর কমিক অভিনয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। ত্রিবিধ কমিক ও ত্রিবিধ ট্রাজিকমিক অভিনয় সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমাদের দেশে অভিনয়ের ফটোরাখা হয় না, তাহাহইলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিভিন্ন-ভূমিকার বিভিন্নাবস্থার ফটো দেখিয়া তরুণ অভিনেতৃবৃন্দ কত শিখিতে পারিতেন, এবং আমাদের দেশে অভিনয়কলা কত দূর উন্নতি লাভ-করিয়াছিল তাহাও জগতের নাট্যসেবীদের নেত্রপথে সংস্থাপিত করা যাইত। বিলাতী ও মার্কিণ-দেশীয় অভিনয়সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জটিল চরিত্রাভিনয়ের বিশিষ্টাবস্থাগুলির চিত্র প্রদত্ত রহিয়াছে। উহাদ্বারা আমরা সেই সেই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠার নমুনা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও 'জলধর', 'বিদ্যাদিগ্‌গজ',

'আবুহোসেন,' 'বিক্রমাদিত্য', 'রড়া', প্রভৃতি ভূমিকার জটিল অংশের অভিনয় কালে যেরূপ মূর্ত্তি ও অঙ্গাদির অবস্থান দেখাইতেন উহাদের ফটো থাকিলে আমাদের যে কত উপকার হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌভাগ্যক্রমে গিরিশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ সুধীগণ তাঁহার কতগুলি ভাবাবেশের ফটো তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই আমরা উহাদ্বারা তাঁহার অলোক-সামান্য অভিনয়প্রতিভার, কথঞ্চিৎ প্রতীতি লোকসমাজে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছি। তাঁহার নবরসের প্রতিমূর্ত্তিগুলি অভিনয়ব্যবসায়ি-মাত্রেরই সাদরে অনুধাবনীয়। আমরা মনে করি ঐ ফটোগুলি ব্রমাইড এন্‌লার্জমেণ্টদ্বারা লাইফ সাইজ করাইয়া প্রতিরঙ্গালয়ে সংস্থাপিত করা উচিত। ভূগোল শিখিতে যেমন রিলিফ ম্যাপ চাই, বিজ্ঞান ও রসায়ন শিখিতে যেমন যন্ত্রাদি চাই, সেইরূপ অভিনয় শিখিতেও সর্ব্বাগ্রে প্রতিরসের আদর্শ চিত্র চাই। দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া অভিনেতা বুঝিবেন আদর্শচিত্রের কতটা নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছেন। প্রথম হইতে এইরূপ শিক্ষাদ্বারা অভিনেতা সহজেই বুঝিতে পারিবেন তিনি কোনশ্রেণীর অভিনয়ে দক্ষতালাভের প্রকৃত অধিকারী। বস্তুতঃ একজন স্বাভাবিক low comic অভিনেতা বহুচেষ্টায়ও একজন ট্রাজিক অভিনেতা হইতে পারিবেন না, বরং চ কমিক অভিনয়ের শিক্ষাদ্বারা ক্রমশঃ তিনি middle comic ও শেষে high comic ও হইতে পারেন। তেমনি স্বাভাবিক একজন low tragic অভিনেতা বহু আয়াসেও ভাল কমিক অভিনেতা হইতে পারিবেন না, বরং চ যত্নে ও শিক্ষায় তিনি হয়তো কালে একজন high tragic অভিনেতা হইতে পারেন। বিমিশ্র tragi-comic অভিনেতা হওয়া

আরও কঠিন। সাধারণতঃ আমরা নিম্নশ্রেণীর tragi-comic অভিনেতাই দেখিতে পাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, কাপ্তান বেল প্রভৃতির ন্যায় high tragi-comic actor বড়ই দুর্লভ। গিরিশ-চন্দ্র অপ্রতিম প্রতিভা ও সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি tragic, কি comic, কি tragi-comic, সর্ব্বত্র তিনি সর্ব্বোপরিস্থিত অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক।

রঙ্গালয়ে একজন অভিনেতা একটি ভূমিকার একরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উহার অভিনয়ে সহৃদয় সুধীবৃন্দের নিকট বিপুল যশোলাভ করিলেন। রঙ্গালয়ের ভাষায় সে ভূমিকা তিনি 'জ্বালাইয়া' দিয়া গেলেন। বহুকাল পরে আবার সেই ভূমিকা আর একজন অভিনেতা উহার অন্যরূপ যোগ্যতর ব্যাখ্যা করিয়া অভিনয়ে তদ্রূপ বা তাহার চাইতে অধিক যশোলাভ করিতে পারেন। অভিনয়ের পরাকাষ্ঠার কোন ও ঠিক মাপকাঠি নাই। যেমন একটি প্রব্লেমের নানা উপায়ে সমাধান হইয়া থাকে, তেমনি একটি চরিত্রের বিবিধ উপায়ে ব্যাখ্যা হইতে পারে। তবে যাঁহার প্রণালী অধিকতর সামঞ্জস্যকর ও সহৃদয়হৃদয়-গ্রাহী তিনিই সে ভূমিকার শ্রেষ্ঠবিশ্লেষক বলিয়া কীর্ত্তিত। নাট্যসেবি-মাত্রেই সেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রের জটিলতা সম্বন্ধে সুপরিচিত। মিসেস্ সিডন্সের লেডি ম্যাক্‌বেথের অভিনয় বিশ্ববিশ্রুত (১)। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘকায়ে লেডি ম্যাকবেথকে যেরূপ

---

(১) সুবিখ্যাত অভিনেতা কেম্বেলের জ্যেষ্ঠ তনয়া সারা ১৭৫৫খৃষ্টাব্দে ৫ই জুলাই ব্রেকণে জন্মগ্রহণ করেন। সারা বাল্যহইতেই, পিতার থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। ১৭৭৫খৃষ্টাব্দে তিনি অভিনেতা সিডনস্ এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে

উৎকট চরিত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে ও তৎপরবর্ত্তিকালে সমুদয় শিক্ষিত জগৎ পরমসমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলেই বুঝিয়া ছিলেন লেডিম্যাক্‌বেথ চরিত্রের পরাকাষ্ঠা ছবি মিসেস্ সিডন্‌স্ দেখাইয়া গিয়াছেন। তারপর যখন বহুদিন পরে সারাবার্ণার (Sara Barnhardt) একেবারে নূতন ভাবে লেডীম্যাক্‌বেথ চরিত্রের বিশ্লেষণ স্বীয় অভিনয়ে দেখাইতে লাগিলেন তখন সকলে একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। যখন লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় সারা পতিপ্রেমময়ী পতির উচ্চপদাভিলাষিণী রমণীরূপে রঙ্গমঞ্চে বিরাজ করিতে থাকিতেন, তখন তাহাকে সর্ব্বস্বার্থ-পরিত্যাগিনী পতিস্বার্থে স্বার্থবতী দেখিয়া কে না চমৎকৃত হইয়াছেন ? পতির হৃদয়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবার অতিনিভৃত আশাবন্ধ তাঁহার পূর্ণমাত্রায় বিদিত ছিল, সুতরাং পতিপ্রাণার পতির জীবনময় বাসনার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যই সব উত্তেজনা, সব অনুপ্রাণনা, এমন কি স্বপ্নাবস্থাতে ও স্বয়ং অনুতাপিনী অনুতাপদগ্ধ পতিকে প্রেমভরে সান্ত্বনা দিতেছেন। এই স্বপ্নবিচরণের দৃশ্যটিতে সারা শেষে এমন অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ করিতেন যেন প্রেমময়ী পত্নী অতিযত্নে ভয়-কম্পিত পতির করধারণ করিয়া শয্যায় লইয়া যাইতেছেন। কি চমৎকার দৃশ্য ! পূর্ব্বাপর কিরূপ সুসঙ্গত ! অথচ মিসেস্ সিডন্‌সের অভিনয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাইবলি প্রতিভাবলে বিভিন্ন অভিনেতা একই

আবদ্ধ হইয়া মিসেস্ সিডনস্ নামে সর্ব্বত্র খ্যাত হন। জটিল নারীচরিত্রের ইনিই শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষক। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন ৭৬বৎসরবয়সে ইনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

চরিত্রের বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণ প্রদান করিতে পারেন। আমাদের দেশেও এইরূপ পরিবর্ত্তন অভিনব নহে। ষ্টারথিয়েটারে যখন প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় হয় তখন গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর high tragic অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয় যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অভিনয়কৌশলে দর্শকবৃন্দের নিকটে অশেষ সাধুবাদ লাভ করিয়াছিলেন। দর্শকগণ বুঝিয়াছিলেন, অমৃত-লালের অভিনয় যোগেশ চরিত্রের আদর্শ। ঈদৃশ অভিনয় আর কখনও হইবে না। অতঃপর কয়েক বৎসর পরে যখন মিনার্ভা-থিয়েটারে ও ষ্টারথিয়েটারে যুগপৎ প্রফুল্লের পুনরভিনয় হয়, তখন মিনার্ভায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার তাৎকালিক বয়স ও স্বরের পরিবর্ত্তন অনুসারে ঐ চরিত্রের এমন এক অভিনব উৎকৃষ্টতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন যে, অমৃত বাবুর বঙ্গবিখ্যাত চিত্তহারী স্বরমাধুর্য্য ও অভিনয়নৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁহাকে গিরিশ বাবুর নিকটে সম্পূর্ণ পরাজিত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, ষ্টারের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রমেশের ভূমিকায় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অননুকরণীয় অভিনয়সত্ত্বেও প্রফুল্লে এবার ষ্টারকে মিনার্ভার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়া ছিল। ঐরূপ মিনার্ভায় বিল্বমঙ্গলের পুনরভিনয়ে শ্রীমতী তিনকড়ি পাগলিনীর ভূমিকায়, সঙ্গীতে অনেক নিম্নে থাকিলেও, সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী ও গায়িকা গঙ্গামণিকে পরাজয় করিয়াছিল। গঙ্গামণি তাহার মধুর সঙ্গীতের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দর্শকগণকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত বটে, কিন্তু তিনকড়ি গতি, চাহনি, ভাবোচ্ছ্বাস, ও বাক্যভঙ্গীতে পাগলিনীকে নূতন

জীবন দান করিয়া দর্শকবৃন্দকে তন্ময় করিয়া দিত। তাহার সঙ্গীত-দৌর্ব্বল্য কেহ বড় লক্ষ্য করিবারও অবসর পাইতেন না। গিরিশচন্দ্র শেষজীবনে তাঁহার কল্পিত অনেক চরিত্রেরই পূর্ব্বাপেক্ষা বিভিন্ন প্রকারে স্বীয় অভিনয়ে বিশ্লেষণ করিতেন। তাই তিনি তাঁহার 'অভিনয় ও অভিনেতা' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন—'যে কোন ভূমিকা যতই উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হউক না কেন সে ভূমিকাগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রকৃত নটের পক্ষে নিন্দার কথা। এই নিন্দা অপেক্ষা অভিনয় করিতে গিয়া নিন্দনীয় হওয়াও শ্রেয়ঃ। ভূমিকাটি সুন্দররূপে অভিনয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টাকরা প্রতি নটের নিতান্ত কর্ত্তব্য। দাবা খেলোয়ারেরা বলিয়া থাকেন 'ভাবিলেই চাল বাহির হয়।' আমরা নট, আমাদের কার্য্যও সেইরূপ, ভাবিলেই চাল বাহির হয়।' বস্তুতঃ শিক্ষকের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নটও চিন্তা করিলে পুরাতন ভূমিকায়ও অভিনব ভাবের বিপুল সমাবেশের বিষয় বাহির হয়। মূল রসগুলির সম্যক্ বোধ থাকিলে, চরিত্র যতই জটিল হউক না কেন উহার বিশ্লেষণ অসাধ্য হইবে না। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অদম্য উদ্যম ও মহতী চেষ্টায়, রায় দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী নাটকের সুদীর্ঘ, পয়ারচ্ছন্দে বদ্ধ কথাগুলিও বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে অতিসুন্দর, দর্শকচিত্তহারিরূপে অভিনীত হইয়াছিল, এমন কি গ্রন্থকার স্বয়ং উহার অভিনয় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার 'সধবার একাদশীর' অভিনয় হইতেও লীলাবতীর অভিনয়ের অনেক প্রশংসা করিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ প্রতিভার গতি সর্ব্বত্র. অপ্রতিহত। তাই অপ্রতিমপ্রতিভ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

বলিতেন—"অসম্ভব কথাটি মূর্খের অভিধানে দ্রষ্টব্য, প্রকৃত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির নিকট অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই।"

পৃথিবীর সর্ব্বত্র কমিক অভিনয়ের মূল কোর্ট ফুল বা বিদূষক। এই কোর্ট ফুল বা বিদূষক বিবিধ শ্রেণীর ছিল। কেহ কথায়, কেহ বেশবিন্যাসে, কেহ বা আকৃতিতে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনে রাজা ও সদস্যগণের হাস্যের উদ্রেক করিয়া প্রীতি উৎপাদন করিত। এই বিদূষকগণ মনুষ্যজাতীয় হইয়াও পশুপ্রভৃতির ন্যায় জীবনধারণ করিত। ইহাদের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে মানবজাতি কেবল স্ব স্ব প্রবৃত্তির ক্ষণিক চরিতার্থতার জন্য কতদূর যে হেয় ও নিন্দনীয়-চরিত্র হইতে পারে তাহা অবগত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। অতিপুরাকাল হইতেই চীনদেশীয়গণ সর্ব্ববিধ শিল্পকৌশলের জন্য বিখ্যাত। উহারা যেমন শিল্পকুশলী তেমনি আবার আচরণে মনুষ্যত্বশূন্য। উহারাই নানা দেশ হইতে বালক বালিকা নিঃস্ব পিতামাতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, কিংবা চুরি করিয়া, স্বদেশে লইয়া গিয়া ঔষধ প্রয়োগে তাহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া নানাবিধ অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা উহাদের আকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি এমন করিয়া গঠিত করিয়া তুলিত যে উহারা দর্শকমাত্রেরই হাসির উদ্রেক করিত। কেবল আকৃতিপরিবর্ত্তন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা সম্পাদন করিয়াই এই সব নৃশংস চীনশিল্পিগণ ক্ষান্ত হইত না, ঔষধ প্রয়োগে বালকদের বুদ্ধিবৃত্তির গোলযোগ ও উচ্চারণশক্তিরও হানি করিয়া দিত। অতঃপর জাহাজে করিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া গিয়া

ভূপতি ও আভিজাতগণের নিকটে পশুপক্ষীর ন্যায় বিক্রয় করিত। এই ব্যাবসায়িগণকে স্পেনিস ভাষায় কম্প্রাপেকেনো (Compra-Pequenos or Comprachios) অর্থাৎ শিশু-ক্রেতা বলিত। ইহারা মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কুক্কুটের আওয়াজের মত করিয়া দিতে পারিত। তারপর শিক্ষা ও ঔষধ দ্বারা মানুষকে একরূপ কুক্কুটাচার করিয়া, বড়লোকদের নিকটে কুক্কুট বলিয়া বিক্রয় করিত। এইসব কুক্কুটাচার মানুষ বড়লোকদের বাড়ীতে প্রতিঘণ্টায় কুক্কুটের ন্যায় ডাকিয়া সময় নিরূপণ করিয়া দিত। আবার ইহারা অতিশিশুদিগকে মৃন্ময় পাত্রমধ্যে এমনভাবে স্থাপিত করিত যে গ্রীবার উপরিভাগ পাত্রের বহির্ভাগে থাকিত। তারপর আহারাদি দ্বারা উহাদের বর্দ্ধন করিত ও সঙ্গীত শিক্ষা দিত। ক্রমে ২।৩ বৎসর পরে বালকদের আকৃতি পাত্রের আকারের মত হইয়া যাইত। পরিশেষে যখন মনে করিত ঠিক হইয়াছে, তখন পাত্র ভগ্ন করিয়া বালককে বাহির করিয়া লইত। এই সব পাত্রাকার সঙ্গীতকারী বালক বহুমূল্যে রাজারা ক্রয় করিতেন। আবার একরূপ অস্ত্র ক্রিয়াদ্বারা উহারা শিশুদের গ্রন্থিগুলি এমন শিথিল করিয়া ফেলিত যে তাহাদের শরীর একেবারে অবশ ও বিকল হইয়া যাইত। অতঃপর এই শিশুগণকে ক্রমে ক্রমে অষ্টাবক্রের মত গঠিত করিয়া রাজাদের নিকটে বিক্রীত করিত। ইহারাই রাজসভায় বিদূষক হইয়া শোভা পাইত। মানুষের দেহের বিকৃতিকরণে ও বুদ্ধিবৃত্তির জড়তাসম্পাদনে ইহাদের মত নিপুণ আর কোন জাতিই ছিল না। অতিপ্রাচীন কাল হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত

ইহাদের ব্যবসায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমভাবে চলিত। ইহাদিগের দমনের জন্য ইয়োরোপে কতবার কত কঠোর দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু কেহই কিছুতে ইহাদের ব্যবসায় ক্ষীণ করিতে সমর্থ হন নাই। ছেলেধরাদের কথা এখনও এদেশে বর্ষীয়ান্‌গণ বিদিত আছেন। আরাকাণদেশীয় মগগণ ও চীনদেশীয়দের সঙ্গে এই ব্যবসায়ে যোগদান করিত। নাট্যাভিনয়ের বিদূষকও এই বালক-বিক্রেতাদের বিরচিত বিকৃতাঙ্গের অনুকৃতি মাত্র। রাজচরিত্র প্রতিফলিত করিতে হইলেই তাঁহার মন্ত্রসচিব, সমরসচিব, ধর্ম্মসচিব, ব্যবহারসচিব প্রভৃতির ন্যায় নর্ম্মসচিবের চিত্রও প্রতিফলিত করিতে হইত। অবশ্য রাজসভার প্রকৃত নর্ম্মসচিব বা বিদূষক প্রায়ই এই সব কম্‌প্রেসিকোদের বিরচিত মনুষ্য পশুগুলিই থাকিত। কিন্তু থিয়েটারে যাহারা অভিনয় করিত তাহারা ইহাদের অনুকরণ করিত মাত্র। কমিক অভিনয়ে এই বিদূষকজাতীয় চরিত্রই নায়কের প্রধান সহচর, সুতরাং উহার অভিনয়ের উপর নাটকের কৃতকার্য্যতার অনেকটা নির্ভর করিত। বিদূষকচরিত্রের অঙ্গবিকার, বাক্যবিকার, গতিবিকার ও বেশাদিবিকারের প্রদর্শন বড় সহজ ছিল না। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বিদূষকের ব্যাখ্যানে লিখিত আছে—

কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাত্ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ॥

অর্থাৎ বিদূষকের পুষ্প কিংবা বসন্তাদি মধুর ঋতুর নামে নাম থাকিবে; সে কার্য্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বেশভূষা ও ভাষায় হাস্যকর

হইবে; তাহার সর্ব্বদা কলহে (অবশ্য কৃত্রিমকলহে) আমোদ হইবে; সর্ব্বোপরি সে স্বকর্ম্মজ্ঞ অর্থাৎ মিষ্টান্ন, লাড্ডু, মতিচুর প্রভৃতি ভোজনে পরম পটু হইবে। বিদূষকের প্রযোজ্য ভাষা-বিচারে আলঙ্কারিকগণ পূর্ব্বদেশীয় ভাষার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বিদূষকটি হাস্যরসের পূর্ণাবতার হইবে। বস্তুতঃ যে নমুনা হইতে নাট্যাদিতে বিদূষকচরিত্র গৃহীত হইত, তাহা সর্ব্বতোভাবে হাস্যরসের অবতারই ছিল। চীনদেশীয় কারিগরের হস্তে ভগবানের বিরচিত মানুষটি একেবারে আকারে, গতিতে, উচ্চারণপ্রণালীতে, কর্ম্মে, সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃতপক্ষে হাস্যরসের অবতার রূপেই পরিণত হইয়া যাইত। সে যে কলহ করিত তাহাও হাস্যময় ছিল। তাহার মূর্খতাও কেবল হাস্যেরই উদ্রেক করিত। ঈদৃশ সচিব বিবিধ কর্ম্মক্লান্ত নরপতির পক্ষে অবকাশকালে বড়ই গ্লানিহর এবং প্রীতিপ্রদ হইত। অদ্যাপি রাজাদের ও অভিজাতগণের সভায় একটি করিয়া ভাঁড় বিদ্যমান। দাসদিগের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দাসব্যবসায় উঠিয়া গিয়া এক্ষণে স্বভাবজ বিদূষকগণই ভাঁড়রূপে বিরাজিত।

হাস্যরসের উদ্ভাবনা সম্বন্ধে প্রবীণ হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়া গিয়াছেন—"হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক তাহাকে একটু অধিক মাত্রায় দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি অপ্রাকৃত, অপরটি প্রাকৃত-বৈষম্য। স্নায়ুবিশেষের উত্তেজনা দ্বারা হাস্যরসের সঞ্চার করা ও

চিমটি কাটিয়া করুণ রসের উদ্দীপনা করা একই শ্রেণীর। হা হা হা করিয়া বা মুখভঙ্গী করিয়া হাসানের নাম ভাঁড়ামি এবং ওগো মাগো করিয়া বা ভূমিতে লুন্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্রেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্য মাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণগানমাত্রই ন্যাকামি নহে। স্থানবিশেষে উভয়ই উচ্চ সুকুমারকলার বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র।"

বস্তুতঃ অসৎ কবির রচনার প্রাচুর্য্যে যেরূপ এক সময়ে সুধী-সমাজকে বলিতে হইয়াছিল 'কাব্যলাপাংশ্চ বর্জয়েৎ', সেইরূপ অসৎ-কবি ও অসৎ অভিনেতার অশ্লীল অভিনয়ের প্রাচুর্য্যে সহৃদয় দর্শক-গণকে বলিতে হইয়াছিল 'হাস্যাভিনয়াংশ্চ বর্জয়েৎ।' প্রকৃত কবির নাট্যগ্রন্থের কোথায়ও হাস্যাভিনয়ে শ্লীলতার বহির্ভূত কিছুই নাই। কালিদাসের বিদূষক সর্ব্বদা হাস্যের মূর্ত্তি হইয়াও কখনও শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। কিন্তু হাস্যার্ণবের অধম কবির অক্ষম হস্তে হাস্য অশ্লীলতাপরিপূর্ণ হইয়া অধমাধম হইয়াছে। বাঙ্গালানাট্যেও দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা ক্ষীরোদপ্রসাদের হস্তে হাস্যরস সহৃদয় উপভোগ্য রহিয়াছে। *

প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারগণ হাস্যরসের বড় একটা প্রাধান্য দেন নাই। কিন্তু মৃচ্ছকটিক-কার হইতে সর্ব্বত্র সংস্কৃত নাটকে হাস্য-রসের প্রাধান্য পরিদৃশ্যমান। ইংলণ্ডে মহাকবি সেক্‌সপীয়রই স্বীয় নাটকে হাস্যের স্থান অতি উচ্চ করিয়া তুলেন।

---

* বর্ত্তমান অভিনয়ে যে দুই এক স্থলে অশ্লীলতা প্রকটিত হয়, উহা অভিনেতার অক্ষমতার পরিচায়ক, নাট্যকারের নহে, কেননা অনেক অক্ষম অভিনেতার ধারণা অশ্লীলতা কমিক অভিনয়ের একটি প্রধান অঙ্গ।

এজগতে বৈচিত্র্য ব্যতীত কোন বিষয়েরই প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ্য নহে। 'গাম্ভীর্য্যের' পার্শ্বে 'হাস্য' এবং 'হাস্যের' পার্শ্বে 'গাম্ভীর্য্য' ব্যতীত ইহাদের কোনটিরই সৌন্দর্য্য পরিপুষ্ট হইবার নহে। যেমন আহারে কেবল পলান্ন, কারি, কোপ্তা প্রভৃতি ভোজন করা যায় না, চাটনি প্রভৃতি উহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ নাট্যাদিতে কেবল গুরুগম্ভীরভাবের উপভোগ অসম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে হাস্য, কৌতুক, রহস্য প্রভৃতির নিতান্ত প্রয়োজন। তবে গুরুভাব যেমন সহজে ফোটে, হাস্য কৌতুক তত সহজে ফোটে না। প্রকৃতহাস্যরসিক অভিনেতা দুর্ল্লভ। অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্দ্ধাধিক সফলতা বিদূষকের চরিত্রাভিনয়ের উপর নির্ভর করে। প্রফুল্ল নাটক 'মদন দাদা', 'কাঙ্গালীচরণ' ও 'জগমণি' চরিত্রের প্রকৃত অভিনয় ব্যতীত আদৌ জমিবে না। বিদূষকের চরিত্রের ঠিক অভিনয় হইত না বলিয়াই শেষে শ্রীমতী তিনকড়ি জনার অভিনয়ে তাদৃশ দর্শকাকর্ষণ করিতে পারে নাই। নলদময়ন্তী নাটকে বিদূষকের তাদৃশ সুরম্য অভিনয় না হইলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ও শ্রীমতী বিনোদিনী তাদৃশ অভিনয় দ্বারাও উহা জমাইতে পারিতেন না। দুর্গেশনন্দিনীতে মুস্তোফীমহাশয় বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা গ্রহণ না করিলে তাদৃশ আদর্শ ওসমান্ ও আয়েষার অভিনয়েও উহা জমিত না। অর্দ্ধেন্দুর অবসানে আর দুর্গেশনন্দিনী কখনও জমে নাই। 'হারানিধি' নাটকখানি এক কাপ্তান বেলের (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) অকাল মৃত্যুতে বন্ধ হইয়া গেল। অনেককাল পরে অমরেন্দ্রনাথ আবার কিছুদিন উহার বেশ

অভিনয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে উহা চিরতরে বোধ হয় বন্ধ হইয়া গেল। নাট্যাভিনয়ে কমিকের অংশ কোন মতেই হেয় বা উপেক্ষ্য নহে। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে উহারা উপেক্ষ্য হইয়াই অনেক সময় নাট্যাভিনয় অনুপভোগ্য করিয়া তুলিয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর কমিক অভিনেতাদের রাজা ছিলেন, ট্রাজিক অভিনয়েও তিনি উন ছিলেন না। সুতরাং নাট্যসাম্রাজ্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে তাহা নাট্যামোদিমাত্রেরই সুবিদিত।

সম্প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে প্রকৃত tragic অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের অবসানে একেবারে লুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রকৃত comic অভিনেতা বুঝি অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইতেছে। সম্প্রতি তাঁহার শিক্ষিত যে কয়েকটী মুষ্টিমেয় কমিক অভিনেতা বর্ত্তমান, তাঁহাদের অবসানে নূতন আর কোথায়ও একটি প্রকৃত comic অভিনেতা মিলিবে না। এক্ষণে নব্যতন্ত্রে কমিক অভিনয় আর বুঝি শ্রদ্ধেয় বলিয়া একেবারে গণ্য নহে, তাই যে সে আসিয়া কমিক ভূমিকায় দাঁড়ায়। তাহাদের বোধ হয় ধারণা যে কোনও প্রকারে হাসাইতে পারিলেই কমিক অভিনয়ে কৃতার্থতা লাভ হইল। সঙ্গীতে সর্ব্বপ্রথমে কমিকপ্রবেশয়িতা নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের জীবদ্দশাতেই যে তাঁহার উদ্ভাবিত প্রথমশ্রেণীর হাস্য-গীতিগুলি ঈদৃশ অপগীত হইবে ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! দ্বিজেন্দ্র-লাল পরপারে বসিয়া তাঁহার চির নূতন অফুরন্ত হাসির ডালা 'কৌতুক সঙ্গীতমালা' যে এরূপ অপগীত হইতেছে তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিতেছেন না। বঙ্গরঙ্গালয়ে সর্ব্বাগ্রে হাস্য-

রসাভিনয়ের সুশিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। রোহিত মৎস্যের কালিয়া একটু খারাপ হইলেও নিতান্ত অখাদ্য হয় না, কিন্তু 'চাটনি', 'ডাল' প্রভৃতি ভাল না হইলে একেবারে অখাদ্য হইয়া থাকে এবং উহারই জন্য সমুদায় ভোজন ব্যাপারের নিন্দা হয়। দৃশ্যাদির সংস্কারের অপেক্ষাও কমিক অভিনয় সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর কমিক অভিনয়ের যেমন উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান কমিক অভিনয় ততদূর উপেক্ষণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অশ্বঘোষ, ভাস হইতে আরম্ভ করিয়া মার্লো, বেনজন্‌সন্, সেক্সপীয়ার, গ্রীণ, মোলিয়র, রেসিনী প্রভৃতি মহাকবি-দের মুক্তাত্মা কমিক অভিনয়ের ঈদৃশ অধঃপাত দেখিয়া নিশ্চয়ই দুঃখে ও ক্ষোভে অশ্রুপাত করিতেছেন। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্বর্গগত আত্মা তাঁহাদের প্রাণপাত সাধনার কমিক অভিনয়ের ঈদৃশ অপব্যবহারে নিশ্চয়ই শান্তিতে নাই।

সম্পূর্ণ।

সম্পাদক—প্রোফেসর উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বি, এ, এম্, আর, এ, এস্ (লণ্ডন্)।

একটাকা সংস্করণের

নাট্য-প্রতিভা সিরিজ

এণ্টিকে ছাপা সিল্কে বাঁধাই। প্রতিমাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে যখন যে জীবনী বাহির হইবে আমরা ভি, পি করিয়া পাঠাইয়া দিব।

প্রকাশিত হইয়াছে ;—

১। গিরিশচন্দ্র। ২। তিনকড়ি।

৩। অমরেন্দ্রনাথ।

৪। বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী।

৫। দ্বিজেন্দ্রলাল।

৬। অর্দ্ধেন্দুশেখর।